wasef'20

Al-Ameen Mission

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah, Ph.: 74790 20059
Central Office: 538 Elliot Road, Kolkata 700 016, Ph.: 74790 20076

SUCCESS AT A GLANCE : 2020

Dazzling Record in NEET (UG)

Marks 626 & above Within AIR 9908 — 61	Marks 600 & above Within AIR 20174 — 134	Marks 580 & above Within AIR 30431 — 238
Marks 565 & above Within AIR 39289 — 322	Marks 550 & above Within AIR 49260 — 434	Marks 536 & above Within AIR 59825 — 516

AIR 916 (675)
Jisan Hossain

AIR 1276 (670)
Tanbir Ahmed

AIR 1522 (666)
Md Samim

AIR 1982 (662)
Ayesha Khatun

AIR 2298 (660)
Al Taufeeq

AIR 2817 (656)
Kanon Akhtar

AIR 2947 (655)
Md Tarip Sk

Higher Secondary (12th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBCHSE	Science	2090	909	1928	2072	2089
	Arts	79	43	66	78	79
CBSE	Science	54	8	24	43	54
	Total	2223	960	2018	2193	2222

Appeared 2223	
From Poor & BPL families	605 (27%)
From lower-middle income group	775 (35%)
From middle & upper middle income group	843 (38%)

81 students have occupied their positions within 20 ranks in the H.S. examinations of the Council

2nd 488 (99.6%) Md Talha

7th 483 (98.6%) Shayna Sultana

9th 481 (98.2%) Qased Akhtar

9th 481 (98.2%) K Abdul Halim

9th 481 (98.2%) Junaid Ahmed

Secondary (10th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBBSE	Boys & Girls	1706	461	1211	1557	1668
CBSE	Boys & Girls	71	21	48	64	70
	Total	1777	482	1259	1621	1738

Appeared 1777	
From Poor & BPL families	627 (35%)
From lower-middle income group	680 (38%)
From middle & upper middle income group	470 (27%)

15 students have occupied their positions within 20 ranks in 10th exam.

7th 686 (98%) S Md Tanveem

8th 685 (97.9%) Md Tahenuzzaman

15th 678 (96.7%) Mir Mosarraf

16th 677 (96.7%) Sk Ansarila

17th 676 (96.6%) Sk Tahlim

মীর রেজাউল করিম কর্তৃক ৩৮, ডা. সুরেশ সরকার রোড,
পশ্চিম ব্লক (দ্বিতীয় তল), কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত

মাসিক

উজ্জীবন

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর মুখপত্র

মে ২০২১
কলকাতা

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ

সভাপতি : আমজাদ হোসেন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

কোষাধ্যক্ষ: মীর রেজাউল করিম

উজ্জীবন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

নির্বাহী সম্পাদক : জে হক

সম্পাদক মণ্ডলী : অনিকেত মহাপাত্র, আজিজুল হক, আবু রাইহান, আমিনুল ইসলাম, এমদাদুল হক নূর, পাতাউর জামান, ফারুক আহমেদ, মীজানুর রহমান, মুসা আলি, শেখ হাফিজুর রহমান, সাজেদুল হক, সুজিতকুমার বিশ্বাস

উপদেষ্টা মণ্ডলী : আলিমুজ্জমান, একরাম আলি, খাজিম আহমেদ, জাহিরুল হাসান, পার্থ সেনগুপ্ত, মিলন দত্ত, মীরাতুন নাহার, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, লোকমান হাকিম, সামশুল হক, স্বপন বসু

প্রচ্ছদ : ওয়াসেফুজ্জামান (**নাম-লিপি** : সম্বিত বসু)

বর্ণ সংস্থাপন : বর্ণায়ন

বিনিময় : ২৫ টাকা

যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭

ই মেল : ujjibanmag@gmail.com, aliahsanskriti@gmail.com

ই মেল এ লেখা পাঠান অথবা ব্যবহার করুন এই ঠিকানা :

মীর রেজাউল করিম, ৩৮ ডা. সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিম ব্লক (তৃতীয় তল),
কলকাতা-১৪

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, নিউ লেখা প্রকাশনী, মল্লিক ব্রাদার্স, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

'উজ্জীবন' আলিয়া-র রূপান্তরিত রূপ

স ম্পা দ কী য়

'সারাদিন কাজ ক'রে সন্ধ্যায় মৃত্যুর/ভিতরে সেঁধিয়ে যাওয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে এভাবে কি দিন যাবে? এভাবে কি যাবে?/...মৃত্যু টুকরো-ফুকরো হয়ে বসে আছে পাশে/ কলকাতার রাস্তা ভেজে গঙ্গার বাতাসে/এভাবে কি যাবে দিন? এভাবেই যাবে?' প্রশ্ন করেছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। প্রশ্নটি আজও রয়ে গিয়েছে—এভাবে কি যাবে দিন? এই বৈশ্বিক অতিমারি, শবের মিছিল, কান্নাভেজা অসংখ্য চোখ, মৃতপ্রায় প্রিয়জনের জন্য উদ্বিগ্ন দিনযাপন—এর শেষ কোথায়? কেউ জানে না। ভরে উঠছে শ্মশান, সমাধিক্ষেত্র। 'আসরাফুল মাখলুকাত' মানুষের আত্মবিশ্বাসেরও বোধ হয় জানাজা, অন্ত্যেষ্টি হয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতেও দেখা যায় না রাজনীতির-লোকনীতির মানবিক মুখ। এখনও চলছে কেন্দ্ররাজ্যের দ্বৈরথ। মুনাফাবাজ পুঁজিপতি-সহায়ক দেশের সরকার জীবনদায়ী ওষুধ, টিকা ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে রাজনীতি করতে ব্যস্ত। এই মৃত্যু উপত্যকায় দাঁড়িয়ে, ডুবন্ত জাহাজের পাটাতনে বসে বেহালা বাজিয়ে চলেছেন এই সময়ের নিরো। অতিমারিকে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যখন গঙ্গায় সারি সারি ভেসে যাচ্ছে লাশ, তখন রাষ্ট্রের অপদার্থতার বিরুদ্ধে সরব হলে জুটছে ইউএপিএ ধারা। এই রাষ্ট্রঋষিরা কি কবিতা পড়েন না? শোনেননি কবির সেই কাতর আর্তি—'মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও/মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও/মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও'। যদিও এই প্রকাণ্ড দুঃসময়ে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে 'প্রকৃত' মানুষের আন্তরিক হস্ত-কল্যাণ। যাঁরা পথ দেখাবেন বলে আনুষ্ঠানিক ভাবে অঙ্গীকার করেছিলেন, অর্থাৎ নেতৃবৃন্দ, তাঁরা আজ গৃহকোণের নিভৃত আশ্রয়ে, আর যাঁদের পথ দেখে অগ্রসর হওয়ার 'কথা', তাঁরা রাস্তায়। বাড়িয়ে দিয়েছেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত। আয়তনে, পরিমাপে ক্ষুদ্র হলেও এই হাতের

কোনও বিকল্প নেই। এঁরাই কার্যত রাষ্ট্র। এঁরাই 'দেশপ্রেমী'। আর যে-দেশপ্রেমের সংজ্ঞা ও বয়ান তৈরি করে ও তার বিপ্রতীপে দাঁড় করিয়ে বিশেষ এক শ্রেণিকে 'অপর' করে ক্রমাগত আক্রমণ ও হেনস্থা করা হয়, সেই দেশপ্রেম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্তে থাকে, নির্বাচনে থাকে, উপাসনালয় ধ্বংসে থাকে, গণহত্যায় বাস করে। জাতীয়তাবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিপদ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা যে কতখানি সত্য, তা টের পাওয়া যায়। এর সমান্তরালে রয়েছে জাতি-ঘৃণা, বর্ণ-বিদ্বেষ, ভাষা-কলহ, সংস্কৃতি-তর্জা। এর কবল থেকে মুক্তি পায়নি পশ্চিমের 'সুসভ্য' দেশগুলিও। জীবাণু মানুষের প্রাণ নিলে অসহায় ঠেকে; কিন্তু মানুষই যদি মানুষের প্রাণনাশে উদ্যত হয়? ফিলিস্তিনের শিশু ও মাতৃকুলের সজল মুখের দিকে তাকানো যায়? এমতাবস্থায় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা বাতুলতা মনে হতে পারে। সত্যিই তো, শান্তির, সাম্যের, ভালোবাসার, লোভহীনতার সপক্ষে এত এত শব্দ ব্যয় হয়েছে আবহমান কাল ধরে, তার ফলাফল কী? এমন প্রশ্ন অনায্য নয়, স্বাভাবিক। কিন্তু এরপরও বলা যায়, এখনও যতটুকু অক্ষত রয়েছে, এখনও যতখানি আশাবাদ ও সহজ মূলে ও মূল্যবোধে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা, তার অনেকখানি সরবরাহ করছে শিল্প ও কলা। এর প্রভাব প্রকট নয়, প্রচ্ছন্ন। দ্রুত নয়, ধীর। তীব্র নয়, মৃদু। আমাদের পত্রিকার চলনভঙ্গিও তেমনই। পরস্পরকে বোঝা ও পড়ার এই আয়োজনে বহু মানুষের কল্যাণ-হস্ত ও প্রণোদনা রয়েছে নিরন্তর। এই পত্রিকা আগে 'আলিয়া' নামে প্রকাশিত হত। এখন তা 'উজ্জীবন' হল। যা-কিছু জীবন-সম্পৃক্ত, যতদূর জীবন প্রবাহিত, ততদূর 'উজ্জীবন'-এর যাত্রা। যাহোক, এই অবসরে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা এবং জীবনানন্দ দাশের কবিতা-পংক্তি দিয়ে আপাতত শেষ করি—'সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;/সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;'। আরও বলি, অব্যাহত থাক 'এই কাজ'।

জীবনকৃতি। আমিনুল ইসলাম । ৭

লোক-রাজনীতি। প্রসূন মজুমদার । ১৪

রম্যালাপ। শুভদীপ মৈত্র। ১৮

কবিতা। ২৩

একরাম আলি। সৈয়দ হাসমত জালাল। গোলাম রসুল
তানিয়া চক্রবর্তী। এন জুলফিকার
সিরাজউদ্দিন। সাঈদ আনোয়ার। বিশ্বনাথ পুরকাইত। শুভ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুবাদ কবিতা । ৩৪
কেদারনাথ সিং । রাহাত ইন্দোরি। কবীর দেব

কথালাপ । ৩৯
জয়দীপ রাউতের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রসূন মজুমদার

উপন্যাস। মুসা আলি। ৫৫

গল্প। ৬৭
নীহারুল **ই**সলাম। পবিত্র সাঁফুই

বঙ্গ-দর্পণ। আব্দুল বারী ৭৭

ভ্রামণিক । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮৪

গ্রন্থ ও পত্রিকা বীক্ষণ। এ টি এম সাহাদাতুল্লা। মীজানুর রহমান **৮৮**

পুনর্মুদ্রণ। সফিয়া খাতুন। ৯২

আমিনুল ইসলাম

রেজাউল করীম : এক অনির্বাণ মনীষা

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও 'শিখা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গঠিত শিখাগোষ্ঠীর ধারক ও বাহকগণ মুসলমানদের মধ্যে যে বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তার অন্যতম সংগঠক ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)। সমাজ নিয়ে যেমন আলোচনা, তেমনি সাহিত্যালোচনাতেও গভীর চিন্তাশীলতা ও মুক্তবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তিনি। অন্নদাশঙ্কর রায়ের কথায় বলা যায়, 'কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন জাতিতে ভারতীয়, ভাষায় বাঙালি, ধর্মে মুসলমান, জীবনদর্শনে মানবিকতাবাদী, মতবাদে রামমোহনপন্থী, সাহিত্যে গ্যেটে ও রবীন্দ্রপন্থী, রাজনীতিতে গান্ধী ও নেহেরুপন্থী, অর্থনৈতিক শ্রেণীবিচারে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, সামাজিক ধ্যানধারণায় ভিক্টোরিয়ান লিবারেল। তিনি মধ্যপন্থী স্বভাবের স্থিতধী পুরুষ।' আবদুল ওদুদ ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবতাবাদকে আশ্রয় করে সমাজকল্যাণের কাজে লাগিয়েছিলেন নিজের কলমকে। আবদুল ওদুদের এই আদর্শ আমরা বহরমপুরের মাড়গ্রামের রেজাউল করীম (১৯০২-১৯৯৩)-এর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর হৃদয়ের ঔদার্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর পারিবারিক উদার পরিবেশের প্রভাব অনেকটা কার্যকরী হয়েছিল। রেজাউল করীম যে সময়ে যে স্থানে (রামপুরহাটের শাসপুর গ্রাম) জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে বেড়ে ওঠেন, সেই পটভূমিটি একটু জেনে নিলে ভালো হয়। পিতা আবদুল হামিদ ছিলেন একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। তিনি আরবি-ফারসিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। রেজাউল করীমের পিতা-মাতা উভয়েই ইসলামের অনুশাসন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন, আবার তাঁদের মানসিক উদারতাও ছিল। 'আমার ছেলেবেলা' নামক ছোটো স্মৃতিচারণায় (আনন্দবাজার, ১১ আগস্ট ১৯৮৫) এসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন রেজাউল করীম। এই উদারতার অন্যতম বড় কারণ ছিল ফারসি সুফি কাব্যের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ও তাঁর চর্চা। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মঈনউদ্দীন হোসায়েন এবং মধ্যম ভ্রাতা আবদুল গনী-ইল আব্বাসি আরবি-ফারসি ভালোবাসতেন। আবদুল গনী আমীর খসরুর কিছু কিছু ফারসি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন সেকালে। আর পিতা আবদুল হামিদ হাফেজ শেখ সাদির কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। এই

রেজাউল করীম

সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই রেজাউল করীমের শৈশব কেটেছে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মহম্মদ কুদরত-ই-খুদা ছিলেন করীম সাহেবের বড় ভগিনীর ছেলে, অর্থাৎ উভয়ে সম্পর্কে মামা-ভাগ্নে ছিলেন। জাতীয়তাবাদী লেখক হিসেবে দেশভাগের আগের দুই দশক প্রতিক্রিয়াশীলতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে রেজাউল করীম নিরন্তর লড়াই চালিয়ে গেছেন। বাংলার ইতিহাসের সেই সংকটময় দিনগুলি তাঁর লেখায় মূর্ত হয়ে আছে। স্বাধীনতা তথা দেশভাগের পর রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি সাহিত্য ও দর্শন নিয়েও বহু লিখেছেন। তাঁর আগ্রহের পরিধি ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও রাজনীতি জুড়ে। তাঁর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য আধুনিক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি। আর ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রশ্নে রক্ষণশীল চিন্তার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক আপসহীন যোদ্ধা। অবশ্য রেজাউল করীম এই চিন্তা জগতের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁর দাদা মঈনউদ্দীন হোসায়েনের (১৮৯০-১৯৬৯) সঙ্গে ১৯১১ সালে কলকাতায় আসার পর থেকে। কলকাতা থেকেই রেজাউল করীম আই এ; ইংরেজিতে অনার্সসহ বি এ ও এম এ করেন। তিনি আইন পরীক্ষাতেও পাশ করেছিলেন। দাদা মঈনউদ্দীন ছিলেন নিখাদ জাতীয়তাবাদী। তিনি প্রথমের দিকে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনুশীলন সমিতির সঙ্গেও তাঁর বিশেষ সংযোগ ছিল। তিনি সেসময়ের যুগান্তর সহ নানা কাগজ

পড়তেন এবং কাছে রাখতেন। রেজাউল করীম সেইসব কাগজের বহু কাটিং দাদার কলকাতার বাসায় দেখেছিলেন। এইভাবে তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে দেশ ও জাতি ধারণার স্ফুরণ হয়েছিল। তিনি ক্রমশ প্রাণিত হচ্ছিলেন দাদা মঈনউদ্দীন কর্তৃক। জাতীয়তাবোধের চেতনা ছাড়াও মঈনউদ্দীনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মজগৎ ছিল। তিনি কলকাতা তালতলা এলাকায় 'নূর লাইব্রেরী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এটি কোনো বইয়ের দোকান ছিল না, তবে নিজস্ব প্রকাশনা ছাড়াও মঈনউদ্দীন বহুজনকে বিভিন্ন গ্রন্থ সরবরাহ করতেন এই সংস্থার মাধ্যমে। রেজাউল করীমের মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে দাদা মঈনউদ্দীন ও তাঁর 'নুর লাইব্রেরী'র সবিশেষ ভূমিকা ছিল।

উদার চিন্তাবিদ ও লেখক এবং ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে রেজাউল করীমের উপমা

সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ছিল বেশ জটিল। বিশেষত মুসলমানরা ছিল দিশাহীন। এই সময়ে আবির্ভূত হলেন রেজাউল করীম। একদিকে তিনি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সঞ্চিত ধূম্রজাল দূরীভূত করার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে যুক্তিবাদী মনন গঠনের প্রচেষ্টায় নিজেকে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন।

খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর প্রথম বই 'ফরাসী বিপ্লব'-এর ভূমিকা লিখেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়। ভূমিকায় রেজাউল করীমের বিশালত্বের পরিচয় দিয়ে বিনয়বাবু লিখেছেন, 'যুবক মুসলমানের কাছ থেকেও বাংলা সাহিত্য এসব সম্পদে ঐশ্বর্যশালী হইতেছে এই কথাটার হিম্মত খুব বেশি। ১৯০৫ সালের পরবর্তী যুগে বাঙালি জাতি যে সকল কারণে নানা প্রকারে দৌলতবন্দ হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার ভিতর বাঙালি মুসলমানের ব্যক্তিত্ববিকাশ ও কর্মতৎপরতা অন্যতম। বাঙালি মুসলমানের শক্তি একালের নয়া বাংলায় কর্মযোগের অপুর্ব বুনিয়াদ রূপে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। তাহাতে হিন্দু বাংলার কোমরও যারপরনাই দৃঢ়তা লাভ করিতেছে। বাংলার নরনারী এক নবীন গৌরবের যুগে পা ফেলিতে চলিল।...আবার দেখিতেছি রফিউদ্দিন আহমদ কলিকাতায় ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ পত্রিকাদি প্রকাশ করিয়া যুবক বাংলার শক্তি যোগের ক্ষেত্র বাড়াইয়া দিতেছেন। এদিকে কয়েক বছর ধরিয়া 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র তদবিরে বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান, দর্শনকে দর্শন, ইতিহাসকে ইতিহাস, সাহিত্যকে সাহিত্য, সকল ধারায়ই মুসলমানের চিন্তা ফুটিয়া উঠিতেছে। আর সেদিন প্রাচীন কবি কায়কোবাদের বক্তৃতায় যে সুর শুনলাম (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৩১) তাহাতে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত শক্তি-গঠিত নয়া বাংলার পূর্বাভাষই সূচিত হইতেছে। রেজাউল করীম সেই নয়াবাংলারই বিশ্ব-শক্তি-সেবী সাহিত্য সাধক।' 'নয়া ভারতের ভিত্তি' গ্রন্থের মুখপত্র অংশেও বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রেজাউল করীমকে 'যথার্থ জাতীয়তাবাদী', 'সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী', 'নির্ভীক লেখক' বলে উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন অখণ্ড বাংলার রাজনীতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে রেজাউল করীমের আবির্ভাব নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যে সময়ে তিনি প্রথম রাজনীতি ও সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন তখন পরাধীন ভারত ছিল ঘোর

দুর্দিনে। নানা জটিল রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যায় মানুষ ছিল জর্জরিত ও বিচলিত। বিশেষত সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ছিল বেশ জটিল। মানুষ, বিশেষ করে মুসলমানরা ছিল দিশাহীন। এই সময়ে আবির্ভূত হলেন রেজাউল করীম। একদিকে তিনি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সঞ্চিত ধূম্রজাল দূরীভূত করার চেষ্টা করেছেন, অপরদিকে যুক্তিবাদী মনন গঠনের প্রচেষ্টায় নানা ভূমিকায় নিজেকে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এই ফাঁকে কলকাতা, বহরমপুর জজকোর্টে ওকালতি ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে রেজাউল করীম খিদিরপুর কর্পোরেশন প্রাথমিক স্কুলে, সালারের জাতীয় বিদ্যালয়ে ও নিজ গ্রাম মাড়গ্রামের নৈশ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৮ সালে অধ্যাপনা শুরু হয় বহরমপুর গার্লস কলেজে। খুব নরম স্বভাবের হলেও লেখার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রবল তার্কিক। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য রেজাউল সাহেব দেশের কংগ্রেস পার্টি সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং ১৯৬৭ সালে তাঁকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদে বসানো হয়। আদর্শের অভাব দেখে তিনি তা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই।

রেজাউল করীম ষাট বছরের অধিক কাল ধরে সমাজ, জাতি ও তার সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশের জন্য সাধনা করে গেছেন। বিশেষ করে মুসলিম সমাজকে গতিময় করে তোলার সাধনায়ও। এই কারণে আধুনিক তুরস্কের প্রধান কারিগর তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সফলতম প্রচারক কামাল আতাতুর্কের জীবন ও আদর্শের জয়গান করে তিনি লিখেছিলেন 'তুর্কীবীর পাশা'। অবশ্য 'ফরাসী বিপ্লব' রচনারও উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনগণের মধ্যে আধুনিকতার প্রসার ঘটানো। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, ফরাসি বিপ্লবের মর্মকথা ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভারতবর্ষের মানুষেরা হয়তো অনুধাবন করতে পারবে না। এখানে চিরকাল ভক্তির যুপকাষ্ঠে যুক্তিকে বলি দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা নানা বিধি-নিষেধের বেড়াজালে বাঁধা পড়েছে। রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্র মানবাত্মাকে যারপরনাই নানাভাবে অপমানিত করেছে, নিষ্পেষিত করেছে। সেখানে মুক্তির পথ দেখিয়েছে ফরাসি বিপ্লব এবং রেজাউল করীম আমাদের সেই বিপ্লবের কীর্তিগাথা মেলে ধরে তার তাৎপর্যের কথা তুলে ধরেছেন এইভাবে, 'কুসংস্কার সমগ্র দেশকে এরূপভাবে গ্রাস করেছিল যে, সমাজের আমূল ধ্বংস করা ভিন্ন তাহাদের অন্য কোনো উপায় ছিল না। রাজা, চার্চ ও অভিজাতবর্গের হস্তে পূর্বের ন্যায় ক্ষমতা রাখিয়া দিলে দেশের মুক্তি, তথা সমগ্র ইউরোপের মুক্তি হইত না। তাই বিপ্লবীগণ সমুদয় অনাচার ও অত্যাচারের ওপর খড়্গহস্ত হইয়া উহার মূল উৎস বন্ধ করিতে চাহিয়াছিল। সেই জন্য তাহারা একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছিল। অতটা না করাই তাহাদের উচিত ছিল। ফরাসি বিপ্লবের সময় মুক্তির নামে বহু অত্যাচার অবাধে চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহাই আবার ইউরোপকে নানাবিধ অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় ও স্বৈরাচারের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছে। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বর্তমান ইউরোপ ফরাসি বিপ্লবের সৃষ্টি। স্বৈরাচারিণী রাজশক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত ইউরোপের কোথাও পার্সোনাল লিবার্টি' বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলিয়া কোনো অধিকারের অস্তিত্বই ছিল না। রাজার ইচ্ছাই ছিল প্রজার ইচ্ছা।' এই বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষ পরাধীনতার

কবল থেকে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, অর্জন করেছে পরিপূর্ণ বিকাশের অনন্য অধিকার। সাম্প্রদায়িকতার বিপদ, জাতীয় সংহতি, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, সাম্প্রদায়িকতার মোহ ও এর বিষময় ফল, স্বরাজ, স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বিধৃত হয়েছে তাঁর 'নয়া ভারতের

'মহেশ' সম্পর্কে এক হিন্দু জমিদার শাসিয়েছিলেন, জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপিয়ে দেওয়া এইসব গল্প যেন মাসিক বা সাপ্তাহিকে ছাপা না হয়, এতে দেশের সর্বনাশ হবে। শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'উপরি-উক্ত হিন্দু মুরুব্বির মতো আবার মুসলমান মুরুব্বিও আছেন। শুনেছি তারা নাকি আদেশ করেন ইতিহাস ফরমায়েশ মত লিখতে।'

ভিত্তি', 'জাগৃহি', 'জাতীয়তার পথে', 'পাকিস্তান এক্সামিনড' (পাকিস্তানের বিচার), 'সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ হোক', 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও গান্ধীজী', 'মুসলিমস অ্যান্ড দ্য কংগ্রেস', 'ইকবাল প্রসঙ্গে' প্রভৃতি গ্রন্থে। তখনকার দিনে রেজাউল করীমের কাছে অনেকের অভিযোগ ছিল, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর কলম যতটা আপসহীন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে তিনি যেন ততটাই নীরব। 'নয়া ভারতের ভিত্তি' বইয়ের নিবেদন অংশে তিনি এর জবাব দিয়েছেন, 'হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা অপেক্ষা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উপর আক্রমণের বেগ একটু বেশি হইয়াছে। হয়ত হইয়াছে। যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে তাহা এ জন্য নয় যে, আমি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে নিন্দা করি না, বরং খুবই নিন্দা করি। তাহা হয়ত এই জন্য যে, হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা দেশের অন্য বিষয়ে ক্ষতি করলেও, হিন্দুদের জাগরণের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু মুসলিম-সাম্প্রদায়িকতা মুসলমানকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে।' তাহাদের মধ্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের পথে প্রধান বিঘ্ন উৎপন্ন করিয়াছে। তাছাড়া ভারতবর্ষের রাজনীতি ও জাতীয়তার ধারণার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহাবস্থান নীতি যে হজরত মোহাম্মদের (সঃ) ঘোষিত আদর্শের পরিপন্থী ছিল না এবং এই কারণেও ভারতীয় মুসলমানদের এক ভারতীয় জাতি হিসেবে মনে করা উচিত, একথাও রেজাউল করীম মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে ওই বইয়ের 'নয়া ভারতের ভিত্তি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: 'মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ মদিনায় প্রবেশ করিয়া ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়কে লইয়া যে 'কমনওয়েলথ অফ নেশন' গঠন করিলেন, তাহা এই বিংশ শতাব্দীতেও বিস্ময়ের বিষয়। তিনি অতি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিলেন যে, কোনো ব্যক্তি যে কোনো ধর্ম পালন করুক না কেন, যখন সে একটা নির্দিষ্ট প্রদেশে বাস করে, তখন সেই প্রদেশের অপরাপর সম্প্রদায়কে লইয়া সে একটি বিরাট, অভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়।...এই আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া মুসলমান কি ভারতের সাধারণ কল্যাণের নিমিত্ত চেষ্টা করিবে না?' (নয়া ভারতের ভিত্তি, পৃ. ৭)।

ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা বিশ শতকের তিরিশের দশকে রেজাউল করীমকে একটি আপসহীন জাতীয়তাবাদে উত্তীর্ণ করেছিল। তাঁর 'নয়া ভারতের ভিত্তি'র প্রবন্ধগুলির উৎস সেকালের

রাজনৈতিক পরিস্থিতির তাৎক্ষণিকতা। এই গ্রন্থ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এক পত্রে লিখেছিলেন (১৮ মে ১৯৩৭): 'আপনার রচিত' নয়া ভারতের ভিত্তি' বইখানি মূল্যবান। ভাষায়, চিন্তায়, হৃদয়ের ঔদার্যে এই গ্রন্থখানি যে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।' স্মরণ করা যেতে পারে, এই প্রবন্ধগুলি লেখার সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৩-৩৪ বছর। প্রবন্ধগুলির মধ্যে কংগ্রেস এবং জাতীয়তার স্বরূপ ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রেজাউল করীমের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয়তা সম্পর্কে চিন্তাবিদ লেকীর সুগভীর আলোচনা, বিশেষ করে 'দ্য হিস্টরি অফ দ্য রাইজ অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য স্পিরিট অফ রেশনালিজম ইন ইউরোপ' গ্রন্থের 'সেকুলারাইজেশন অফ পলিটিক্স' অধ্যায়টি বিশেষভাবে তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। আর ছিল মনীষী বার্কলের 'দ্য হিস্টরি অফ সিভিলাইজেশন ইন ইংল্যাণ্ড' গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক সমাজবিশ্লেষণ। রেজাউল করীম মনে করতেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মের অযথা অনুপ্রবেশ শিক্ষার উদার বোধ ও ধারণাকেও বিঘ্নিত করে। 'বিদ্যালয়ে ধর্মানুষ্ঠান' নামে এক প্রবন্ধে তিনি বলেন: 'প্রত্যেক দেশের তরুণ সম্প্রদায় এই ধর্মান্ধতা দূর করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তরুণের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্লোগান হইতেছে যুক্তি, জ্ঞান ও উদারতা।' ঢাকায় ইন্টারমিডিয়েট কলেজের হস্টেলে তখন সরস্বতী পূজা করার প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে একটা সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। কলেজ অধ্যক্ষ এই পূজা এবং তার পালটা গো-কোরবানীর প্রস্তাব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে উক্ত প্রবন্ধে রেজাউল করীম লেখেন: 'যেসব পত্রিকা নিজেদেরকে জাতীয়তাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক বলিয়া দাবী করেন, তাহারা ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষকে অযথা আক্রমণ করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। আমরা আশা করি, অতঃপর সমস্ত বিদ্যানিকেতন হইতে ধর্মানুষ্ঠান একেবারেই উঠিয়া যাইবে। এই ধর্মানুষ্ঠান রহিত করিবার আন্দোলনে আমরা ছাত্র সম্প্রদায়কে পুরোভাগে দেখিতে চাই।' এ যেন বিদ্যাসাগরের কণ্ঠস্বর। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিদ্যাসাগরের মত রেজাউল করীমেরও এই স্বপ্ন সফল হয়নি। বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় থেকে ধর্মানুষ্ঠান রহিত করবার আন্দোলনে আমরা আজও ছাত্র সম্প্রদায়কে পুরোভাগে দেখতে পেয়েছি কি? শিক্ষক-অধ্যাপককে কি দেখতে পেয়েছি? কিছুদিন পূর্বেও, একুশ শতকের অগ্রবর্তী বিজ্ঞান-চেতনার যুগেও এক উচ্চ বিদ্যালয় প্রধান, বিদ্যালয় থেকে ধর্মানুষ্ঠান তুলে দেবার যে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, দেশের বহু আলোকপ্রাপ্ত নাগরিক সেকালে তার বিরোধিতা করেছিলেন। এই সূত্রে রেজাউল সাহেবের আরও একটি নিবন্ধের অবতারণা এখানে করা যেতে পারে। নিবন্ধটি ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাটির শিরোনাম ছিল 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মুসলমানের অভিযোগ ও তাহার স্বরূপ।' 'বিচিত্রা'র এই সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের একটি অভিভাষণও ছাপা হয়েছিল। লিখিত অভিভাষণটি ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১৫ শ্রাবণ ঢাকায় পাঠ করেছিলেন শরৎচন্দ্র। ওই অভিভাষণে শরৎচন্দ্র উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেছেন, 'যদিও এর নাম দিয়েছেন মুসলিম সাহিত্য সমাজ তথাপি এই নির্বাচনের মধ্যে একটি পরম ঔদার্য আছে। আমি হিন্দু অথবা মুসলমান সমাজের অন্তর্গত, আমি বহু দেবতাবাদী অথবা একেশ্বরবাদী এ প্রশ্ন

বাম দিক থেকে বার্কলে এবং লেকী

আপনারা করেননি। শুধু ভেবেছেন আমি বাঙ্গালী, বঙ্গ সাহিত্যের সেবায় প্রাচীন হয়েছি।...অতএব সেই স্থানটি অকুণ্ঠচিত্তে আমাকে দিয়েছেন।' আলোচনার অন্যত্র অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে তাঁর মহেশ' গল্পের প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন, 'মহেশ গল্পটি ম্যাট্রিক-এর পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে বলে জানতে পেরেছেন, কিছুকাল পরে জানতে পারেন সেটি স্থানচ্যুত হয়েছে। কেন? না ওই গল্পটিতে নাকি গোহত্যা আছে। অহো। হিন্দু বালকের বুকে যে শূল বিদ্ধ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কর্তামশায় 'মহেশ' গল্প সরিয়ে সেখানে তার স্বরচিত গল্প 'প্রেমের ঠাকুর' অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'মহেশ' সম্পর্কে এক হিন্দু জমিদার শাসিয়েছিলেন, জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপিয়ে দেওয়া এইসব গল্প যেন মাসিক বা সাপ্তাহিকে ছাপা না হয়, এতে দেশের সর্বনাশ হবে। শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'উপরি-উক্ত হিন্দু মুরুব্বির মতো আবার মুসলমান মুরুব্বিও আছেন। শুনেছি তারা নাকি আদেশ করেন ইতিহাস ফরমায়েশ মত লিখতে।' 'বুলবুল পত্রিকা' শরৎ সাহিত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছে, 'শরৎবাবু তাঁর রাশিকৃত উপন্যাসের ভিতর স্থানে স্থানে মুসলমান সমাজের যেসব ছবি এঁকেছেন তা মুসলমান সমাজের খুব উঁচু দরের লোকের নয়।' এর প্রত্যুত্তর দিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'কিন্তু জিজ্ঞাসা করি উঁচু নীচু স্তরের পাত্র-পাত্রীর উপরেই কি উপন্যাসের উচ্চতা-নীচতা, ভালো-মন্দ নির্ভর করে?' প্রশংসা করেছেন ওই রচনার উপসংহারের প্রতি যেখানে লেখা হয়েছে, 'হিন্দু সমাজের বিবিধ গলদ ও সমস্যা নিয়ে শরৎচন্দ্র যেসকল গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন এবং প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তাঁহার সমাজকে যে চাবুক কশেছেন, সদিচ্ছাপ্রণোদিত এমনধারা নির্ম্মম কশাঘাতও মুসলিম সমাজ অম্লান বদনে গ্রহণ করবে না তা জোর করে বলতে পারি। বাঙ্গালার কথাসাহিত্যিক সম্রাটকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি।'

....ক্রমশ

প্রসূন মজুমদার

ক্ষমতা-সমতার ভবিষ্যৎ

বাঙালির চৈতন্য আসলেই বাম-চৈতন্য। মার্ক, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিনের নাম করেই হোক আর মা, মাটি, মানুষের নাম করেই হোক বাঙালি পছন্দ করে একটি ভদ্রস্থ মানবদরদী সরকার। ক্যাপিটালিজম সবসময়েই চাইবে যে এমন একটা বিধানসভা তৈরি হোক যেখানে বামেদের চাপ থাকবে না। সেইজন্যেই এত টাকা ঢেলে পাবলিক পারসেপশন তৈরি করা হল যে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে।

পশ্চিমবাংলায় নির্বাচনের রেশ কাটার আগেই করোনাভাইরাস হরদম তার ছানা বিয়োতে শুরু করেছে। প্রতিদিন কোনও না কোনও পরিচিতের মৃত্যুসংবাদ মনটাকে যেন অগাধ পানিতে চুবিয়ে চুপসে দিয়েছে। তবু আমি আর কী বলি! সেই জীবনবাবুই তো বলে গেছেন, 'মানুষের মৃত্যু হলে তবু মানব থেকে যায়'। অতএব যারা ওই থেকে যাওয়া মানবের লিস্টে এখনও ঠেকে আছে তাদের ঠেকচর্চায় রাজনীতির হালহকিকৎ নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই হয়। তাই নির্বাচন পরবর্তী বাংলার অবস্থা নিয়ে প্রতিহিংসার রাজনীতি চলে বিরোধী দলের কর্মীদের প্রহার, খুন, ধর্ষণ, বাড়ি পোড়ানো ইত্যাকার বহুপরিচিত জয়দম্ভের আস্ফালন দিয়ে। কিন্তু প্রতিহিংসার প্রতিহিংসা দেখিয়ে রাজ্যের বিরোধী কিন্তু কেন্দ্রের শাসকদল আবার ঘুষ কেলেঙ্কারির পুরোনো ডায়রি খুলে মন্ত্রীদের ঢুঁসিয়ে কর্মীদের খুশিয়ে দিতে চান। দল চাঙ্গা হয়, অপর বিরোধীর বিধি বাম আগেও ছিল এখন আরও তারা নাঙ্গা হয়। আজকে অবশ্য আমার এই লেখা রাজ্যে চাঙ্গা ও নাঙ্গা এই দুই বিরোধীশিবিরকে নিয়ে নয়। তবে আমি আজ ভবিষ্যৎ বঙ্গ-রাজনীতির গতিপথ খুঁজতে খুঁজতে আপনাদেরও যখন সঙ্গে নিয়ে যাব তখন এই লেখায় চাঙ্গা ও নাঙ্গা নামেই দুই বিরোধী দলকে আমরা ডাকব, কারণ তাতে লিখতেও হয় কম আর রূপকও বড় সঠিক চিহ্নায়কের মর্যাদা পায় বলেই মনে হয়।

এই চাঙ্গা দাদা আর নাঙ্গাদাদা এখন এই লেখার দুই দাদা। দুই দাদাকে নিয়ে আমার দুইখান কথা আছে। প্রথম কথাটা হল চাঙ্গাদাদা আড়ে ও বহরে বিপুল বেড়েছে। তাদের তিন থেকে তিরিশও নয় সেই তিরিশের তিনগুণ মতো বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচ বছর আগের তুলনায় তাদের বৃদ্ধি প্রায় তিরিশ গুণের কাছাকাছি। তিন দশে তিরিশগুণ বাড়বৃদ্ধির জন্যে ত্রিশূলনীতি দায়ী না ত্রিনেত্রা দায়ী তার ছানবিন এখন করব না। এখন শুধু দ্বিতীয় কথাটা পাড়তে চাই। সেই কথাটা হল যে, চাঙ্গা দাদার চাঙ্গা হয়ে ওঠায় আমাদের নাঙ্গা দাদা আধ ন্যাংটা দশা থেকে ফুল ন্যাংটা হয়ে গেছে। বন্ধুরা, এইবার ভাবুন যে, রাজনীতির পাশা কী পরিমাণ গুবরেপোকায় ভরে গেল!

যাক এতক্ষণ অনেক মজামস্করা হল, এবার একটু চিন্তাভাবনা করে মনোযোগ দিয়ে চলুন বুঝতে চেষ্টা করি, যে আগামী পাঁচ বছর বাংলা কেমন থাকবে। বাংলার বিধানসভা বামশূন্য। বামের জোটশরিক আব্বাস ভাইজানের দলকে কেউ এইকথায় টেনে আনবেন না, কারণ ভাইজান সেকুলার কি না সন্দেহ, আর বাম তো নয়ই। সুতরাং স্বাধীনতার পরে এই প্রথম বাংলার বিধানসভা মার্কিন ক্যাবিনেটের যেন ছায়া। সেখানেও যেমন দক্ষিণপন্থী দুই দলের মধ্যেই একদল শাসক আর অন্যদল বিরোধী, এখানেও তেমনই। এমনকি ওই মার্কিনীদের মতোই শাসকদল নরমপন্থী ডান আর বিরোধী দল চরম দক্ষিণপন্থী। বামেরা আগামী পাঁচ বছরে বাংলার নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকাই নিতে পারবে না। মাঝেমধ্যে আমার এতে মজা লাগছে না যে তা নয়, তবে ভয় করছে এটা ভেবেই যে বামেদের অনুপস্থিতি বিধানসভা অনুভব করবেই। দুর্নীতি, দমনপীড়ন, নারীর অধিকার এই সমস্ত ক্ষেত্রে বামেদের (সে যতই ভুষি বাম হোক না কেন) মতামত অন্তত একটা নোট অফ ডিসেন্ট-এরও দাম থেকেছে এতদিন। এবার সেটা হবে না। উপরন্তু আলোচনা চলবে হিন্দুর অধিকার, মুসলিম তোষণ এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবনা নিয়েই। উন্নয়ন কতটা হবে জানা নেই; তবে বিজেপি চাইবে চাপ দিয়ে তৃণমূলের ঘর ভাঙতে। সেই প্রক্রিয়া শুরুও হয়ে গেছে তিন প্রভাবশালী মন্ত্রী-বিধায়ককে গ্রেফতার করার মধ্য দিয়ে। কেন তৃণমূল ভেঙে সরকার ফেলে তৃণমূলের নির্বাচিত বিধায়কদের দলে টেনে বাংলায় সরকার গড়তে চাইছে বিজেপি। কারণ এই বাংলায় ২৭ শতাংশ মুসলমান আর অন্তত ১০ শতাংশ স্পষ্ট সেক্যুলার জনসমষ্টির ভোট নিশ্চিতভাবেই তাদের বিপক্ষে যাবে এবং সেটা হলে কোনদিনই বিজেপির পক্ষে পশ্চিমবাংলায় সরকার গড়া যে সম্ভব নয় সেটা বিজেপির যেকোনো নেতাই পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। তাই সরকার গড়ার প্রথম এবং সর্বোত্তম স্ট্র্যাটেজি হিসাবে ঘোড়া কেনাবেচাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে বিজেপি। ভোটপ্রক্রিয়ায় জেতার জন্যে তারা আব্বাস সিদ্দিকি আর তার জোটের মুসলমান ভোট কাটার সম্ভাবনার নিরিখে অংক কষেছিল; কিন্তু সেই অংকে জল ঢেলে দিয়ে বাংলার মানুষ তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকার গঠন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর দাঙ্গা, হাঙ্গামা করে এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে পিছনে লেলিয়ে দিয়ে সরকারকে অতিষ্ঠ করেই চলবে।

তবে এই ক্ষেত্রে একটা চক্রান্ততত্ত্বও আছে। সেটা এবঙ্গের তথাকথিত বামফ্রন্টের প্রিয় তত্ত্ব হলেও সেই বিজেমূলের ভাবনাকেও আমাদের এক্কেবারে ফেলে দিলে চলবে না। এমন হতেই পারে যে ৩০ বছর বামফ্রন্ট যেভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে অলক্ষ্য সেটিং করে চালিয়ে গিয়েছিল তেমন তৃণমূলও তাদের বহু যুদ্ধের সাথী বিজেপির সঙ্গে সেটিং করেই চালিয়ে যাবে। বিধানসভায় তৃণ আর লোকসভায় পদ্মকুসুমসঙ্কাশ হতেই থাকবে এই বঙ্গ নির্বাচনে। বাকিটা আই-ওয়াশ। চোখে ধুলোর এই তত্ত্ব সঠিক হলে বলতে হবে অংক জটিল নয় তেমন। অর্থাৎ রাজ্যে শাসক তৃণমূল আর বিরোধী যদি বিজেপি হয় তবে বাম আন্দোলনকে একেবারেই দুচ্ছাই করা সম্ভব হবে। ক্যাপিটালিজম সবসময়েই চাইবে যে এমন একটা বিধানসভা তৈরি হোক যেখানে বামেদের চাপ থাকবে না। সেইজন্যেই এত টাকা ঢেলে নির্বাচনের আগে এত চ্যানেল লঞ্চ করে পাবলিক পারসেপশন তৈরি করা হল যে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। এই ভয়টা মিডিয়া খুব সফলভাবে বাংলার মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিতে পারল। তাই ভোটে দুর্নীতি ইস্যু হল না, ইস্যু হল "খেলা হবে"। এখন ভবিষ্যৎ জবাব দেবে যে, দুই দলের ডিজে বাদ্যে যে "খেলা হবে" বেজে উঠল সে খেলা আসলে বামবিদায়ের চতুর কর্পোরেট খেলা কিনা।

ভবিষ্যৎ যা-ই বলুক না কেন বামফ্রন্ট অর্থাৎ কিনা সিপিএম যে এই ভোটখেলায় চোট খেল তার জন্যে তারা যতই মিডিয়া আর বিজেমূল তত্ত্ব দিয়ে কোল্যাটারাল ড্যামেজের বুলি আওড়াক না কেন, বাস্তব বলছে যে তাদের নিজেদের সমর্থকরাই এই ভোটে তাদের ত্যাগ করেছে। এমন উজবুকুমো চালাতে থাকলে আবার পরেও তাদের মানুষ এইভাবেই প্রত্যাখ্যান করবে। বাম আন্দোলনের এখন সত্যিই আর সিপিএমের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা উচিত নয়। সময়ের দাবী মেনেই এবার ফলিত বুড়োদের পলিটব্যুরো থেকে বাম-ভাবনাকে রাস্তায় নামিয়ে আনতে হবে। সেটা করতে হবে বাঙালির স্বার্থে। কেন? কারণ খুব সরল এবং সোজা। বাঙালির মননে চৈতন্য, লালন, উনিশ শতকীয় পুনর্জাগরণের বিস্তার। তাই বাঙালির চৈতন্য আসলেই বাম-চৈতন্য। মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিনের নাম করেই হোক আর মা, মাটি, মানুষের নাম করেই হোক বাঙালি পছন্দ করে একটি ভদ্রস্থ মানবদরদী সরকার। সেই ক্ষেত্রে বামেদের দরকার। কিন্তু বামেরা নেই। ভোটের আগে দেখা গেল দশ বছরের বনবাসের পরেও বামেরা তাদের ক্ষমতালালসা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তারা লক ডাউনের সময় ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য কমিউনিটি কিচেনাদি নানান জনসেবামূলক কাজ করেছে সত্যি, কিন্তু জনদরদী কাজের জন্য কেউ যদি বাহবা দাবি করে বা দুঃসময়ে সাহায্য করার প্রতিদান হিসাবে ভোট দাবি করে তবে তাদের সেই জনহিতকর কাজগুলোকে মানুষ নিতান্তই সন্দেহের চোখে দেখতে যে বাধ্য হবে এটা স্বাভাবিক। ফলে রেড ভলান্টিয়ারগিরি করে লোকের হাততালি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বাংলায় ভোট পাওয়ার জন্য শেল্টার বা আশ্রয় দেওয়াটাও খুব জরুরি। তাই আগামী পাঁচ বছর বাংলার মুসলমান এবং সেক্যুলার জনগোষ্ঠী মমতা ব্যান্যার্জির কাছেই যে আশ্রয় নেবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কথাই নয়। কিন্তু বামেরা কী করবে! বামেরা নিজের কবর খুঁড়েছে ভাইজানের ধর্মীয় অবস্থানকে পাত্তা না দিয়ে কেবল মুসলমান ভোট কাটার অথবা পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে। সিপিএম তার

হাত ভাইজানের ধর্মভাবনার রঙে চুবিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। এই অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে সেই রঙ তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের প্রধান শত্রু মুখে বিজেপি হলেও কার্যক্ষেত্রে যে তৃণমূল এটা ভোট পূর্ববর্তী জোটগঠন থেকে শুরু করে প্রচার এবং ভোটপরবর্তী হিংসায় তাদের বিবৃতি অথবা নারদকাণ্ডে অতিমারির সময়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে মতামতের ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই বারবার প্রমাণ করেছে। ফলে যে প্রত্যাখ্যান তারা ভোটে মানুষের কাছ থেকে পেয়েছিল এখন ভোট হলে আরও বেশি প্রত্যাখ্যান তাদের হজম করতে হবে।

এমত অবস্থায় বাংলার মানুষ, হ্যাঁ সেই মানুষ যাদের চৈতন্যে বামভাবনার সমন্বয় থেকে শুরু করে যৌথজীবনের সংস্কৃতিতে জারিত হয়ে আছে তারা বামের নামে বদনাম করা সিপিএম-কে ভুলে বামদিকে হেলে থাকা নব্য জনদরদী দল তৃণমূল কংগ্রেসের উপর আস্থা রেখেছে এবং আমার মতো অসংখ্য মানুষ মনে করে যে ঠিকই করেছে।

তবে আপাতত বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষী বিজেপির হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানো গেছে বটে, কিন্তু আগামীদিনে বাঙালি নতুন বামদলের পথ চেয়ে থাকবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যতই জনদরদী হোন না কেন, তাঁর বিপুল ক্যারিশমা ছাড়া তাঁর দল ম্লান শুধু নয় দুর্নীতির পাঁকে পুঁতে থাকা নুনের পুতুল। একটু সুযোগ পেলেই সেই পুতুলকে নাচানো সম্ভব বলে বিজেপি এই রাজ্যে এতটা বাড় বাড়াতে পারল। এখন ব্রাত্য বসুর মতো স্বরে "মমতা ব্যানার্জি বাঙলার ইভা মোরালেস" বলে কিছুদিন হয়তো আমরা বিজেপিকে ঠেকাতে পারি, কিন্তু যেহেতু তৃণমূল দলে ন্যূনতম রেজিমেন্টেশনও নেই তার ফলে নিয়ন্ত্রণহীন নেতানেত্রীসহ সমর্থকদের রাজনৈতিক ব্যাভিচারকে সম্পূর্ণ বিনাশ করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

তাই বাংলার শর্ট টার্ম পরিত্রাতা মমতা হলেও সুদূর ভবিষ্যতের জন্য অদূর ভবিষ্যতেই নতুন বাম আন্দোলনের প্রয়োজন। সেই বামেদের নেতৃত্বে সিপিএম না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কারণ যারা ইতিমধ্যেই মানুষের আস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হারিয়েছে তাদের ওপর বাজি ধরা আর বেতোঘোড়ার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখার মহড়া দেওয়া প্রায় একই বস্তু। এখন সময় এসেছে বামভাবনাকে রাজ্যের বদলে যাওয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করার। নতুন প্রাণ নিয়ে নতুনভাবে শুধু নয়, নতুন নামে সমস্ত বামশক্তিকে এক জোট করে রাজ্যের নবসৃজনের বার্তা নিয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন। তা যদি না হয় তবে হনুমানপুজোর সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাংলাকে মোদীয় প্রভুভক্ত বানিয়ে ছাড়বেই।

যে সমাজে ৫০ শতাংশের কাছাকাছি মহিলা ভোটার সেই সমাজের অবশ্যই আশা করা উচিত মহিলামুক্তি আন্দোলনের বিবিধ সংগঠন থেকে নতুন বামনেত্রী উঠে আসবে। এই নতুন নেত্রীরা পুরোনো বাম আন্দোলনের দিশায় পরিবর্তিত সময়কে পর্যালোচনা করে জনগণের জন্য নিশ্চিত স্বস্তির স্বপ্ন বয়ে আনতে পারবে। সুতরাং আপাত স্বস্তির আড়ালে অস্বস্তির যে হিন্দু-মৌলবাদের চোরকাঁটা আগামী পাঁচবছর আমাদের খোঁচাতেই থাকবে, তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য মহিলাশক্তির বিপুল উত্থানে নতুন বামদল গঠনের পথে এগিয়ে যাওয়া যায় কিনা সেই কথাটা পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী, লিবেরাল এবং সেক্যুলার জনগোষ্ঠীর নিবিষ্টচিত্তে ভেবে দেখার সময় উপস্থিত।

শুভদীপ মৈত্র

কমলহাক্লান্তের দপ্তর থেকে

কমলাকান্ত ছিল আফিমখোর। তবে এই আধুনিকোত্তর পৃথিবীতে জন্মে আলাদা করে কোনো একটি নেশার দরকার পড়ে না। জীবনই ব্যক্তির জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে দেয়। এই বঙ্গে নব-মিলেনিয়ামে চোখ খুলেই যে বিস্ময় তা আমাদের এই বেবাক ব্যর্থ কিন্তু তা সত্ত্বেও শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে টিকে থাকা যুবকটির হয়েছিল। তার নাম সে বলতে ইচ্ছুক নয় বলেই কমলাকান্তর সঙ্গে মিলিয়ে তার নাম রেখেছে তার খেরোর খাতায়; এবং সে কোনোভাবে বঙ্গ-রঙ্গের তামাশা-মুখর সব গম্ভীর ঘটনাবলির মূল মঞ্চের পাশে কোনোভাবে হাজির থাকতে পেরেছিল যেহেতু তাই তার দপ্তরখানাও কমলাকান্তর মতোই খানিক আমোদ দেবে এই ভরসায় তাকে হাজির করছেন এই অধম .....

হৌজ অ্যানার্কিস্ট

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাঁচা আঁতলামি দূর হয় এবং জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। আমারো হয়েছে। আন্দাজ, আঁতলামি অর্থে অনর্থক অ্যানার্কিজম যা নিয়ে উদ্বাহু হতে পারছি না। এ অ্যানার্কি হল কাফি-হৌজ-অ্যানার্কি। এখন সমস্যা হল কাল-বৈগুণ্যে তা কিছু আমার থেকে ঝুনোতরো এবং পাকাচুলোদের এ অস্তিত্ব-প্রশ্ন এবং তাদের কয়জনের তা প্রণামীর চাল-কলা—অর্থাৎ ভিমরুলের চাল একখান রয়েছে—তবু যেহেতু আমার হাঁড়ির ভাত এইসব কাজে ফোটে না কাজেই খোলাখুলি এসবের তত্ত্বতালাশ করাই যায়।

অ্যানার্কিজমের ভাল মন্দ এ লেখার বিষয় নয়, বিষয় হল কাফি-হৌজ অ্যানার্কিজম যা সোশ্যাল মিডিয়ার বদৌলতে বিকশিত হয়েছে। ক্ষমতার কোনো রকম প্রকাশ দেখলেই তা ভাঙতে হবে এবং কোনো রকম মান্য তত্ত্ব, সন্দর্ভ, ব্যাকরণ ইত্যাদি মানা যাবে না এবং মানলেই তা দক্ষিণপন্থা ও ফ্যাসিশক্তির সমর্থন। আনখশির এই বিপ্লবীরা মনে করেন যে সিস্টেমের দাসত্ব ভাঙার এই এক পন্থা—অর্থাৎ পন্থাহীনতা। এবং একে এঁরা বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন বুঝতে পারি কারণ এরা পন্থাহীনতার চেষ্টায় এতই সচেষ্ট যে নিশ্চেষ্ট হয়ে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকতে পেরেছেন, সোজা কথায় কিস্যু করেন না আর-কি। এ পথে বহু গুণী হেঁটেছেন এর আগে, প্রাগ্রসরেরা এখনও অনেকেই ক্বচিৎ যাদবপুর বাজারের দো-তলা ও অ্যালবার্ট হলে পায়ের না হলেও চটির ধুলো দেন, যদি না সংসার

হিল্লের নাম অ্যাক্টিভিজম। তা সোশ্যাল মিডিয়া থাকায় এ দিকে বড় সুবিধে হয়েছে, মা ষষ্ঠীর কৃপায় অ্যাক্টিভিজমের ইস্যুই ইস্যু। আজ বাংলা সংস্কৃতি বাঁচাও, তো কাল ভাষা বাঁচাও, পরশু পরিবেশ তো তরশু পরিচিতি, ভিনদেশে বা বহুতর কিলোমিটার দূরের রাজ্যে কারো মুক্তি তো কারো কারাবাস চাই—আবেগ জর্জর ভাষায় লিখে লটকে দিলেই হল ভার্চুয়াল-দেওয়ালে

অথবা রিহ্যাবের মেট্রনদের চোখ-রাঙানোতে বেপথু হয়ে পড়েন।

তা এরা মোটামুটি কঠোর লোকান্তর সাধনাতেই যৌবন কাটিয়ে দেন, এমনকি অনেকে সারা জীবনও। তাতে অসুবিধে ছিল না ক্ষ্যাপারা চিরদিনই থাকবে—কিন্তু এদের কিয়দংশ একটা সময়ের পর চান প্রণামী বা ভক্তকুল বা উভয়ই। তখনই তাদের ওই ব্যক্তিগত যা কিছু তত্ত্ব, যা উৎকেন্দ্রিক ও আড্ডার প্রলাপ হিসেবে মিষ্টি, হাজির হয় কপচানির পচা দুর্গন্ধ বয়ে। এদিকে যুবক এখন প্রৌঢ় এবং আশপাশে তাকিয়ে বোঝেন, যা যৌবনে ছিল ফুলের মালা এখন তা কাঁটার। এবং সেই উৎকেন্দ্রিক অ্যানার্কি-বিলাস, সব-ঝুট-হ্যায় বলার নতুন রাঁধুনি হাজির। ফলে ভিতরে ভিতরে সংকট। এমন সময় যদি কোনোক্রমে একটা হিল্লের উপায় পাওয়া যায় তো ছাড়ে কে!

এই হিল্লের নাম অ্যাক্টিভিজম। তা সোশ্যাল মিডিয়া থাকায় এ দিকে বড় সুবিধে হয়েছে, মা ষষ্ঠীর কৃপায় অ্যাক্টিভিজমের ইস্যুই ইস্যু। আজ বাংলা সংস্কৃতি বাঁচাও, তো কাল ভাষা বাঁচাও, পরশু পরিবেশ তো তরশু পরিচিতি, ভিনদেশে বা বহুতর কিলোমিটার দূরের রাজ্যে কারো মুক্তি তো কারো কারাবাস চাই---আবেগজর্জর ভাষায় লিখে লটকে দিলেই হল

ভার্চুয়াল-দেওয়ালে। তারপর আন্দোলন?—সে তো জনগণ পথে নেমে করবে, পা মেলানো যায় যদি লবনহ্রদবাসী ধুতিবাবু ডাক দেন, না হলে জনগণ তো আছেই।

ছদ্ম-কমঠবৃত্তি না হয় নেওয়া গেল, কিন্তু অ্যানার্কিজম কেন আবার?—কারণ প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা সর্বকালেই এক ধরনের হাততালি জুটিয়ে এসেছে এবং তাকে একটা এক্সট্রিম চেহারায় ভাবনাগত ভাবে নিয়ে গেলে কারো সমস্যা হয় না কারণ এসবই ব্যক্তিগত লীলা, দায় নেই তো ক্ষমতার উৎপাটনের চেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ করা। সে দায় মানুষের কাঁধে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত। এরা কথায় কথায় বলে মানুষ কী চায়—যদিও তার সমর্থনে আধখানা সমীক্ষাও তারা দেখাতে পারেনি আজ পর্যন্ত। স্বাভাবিক ব্যাপার সর্বক্ষণের অ্যানার্কি নিয়ে সাধারণ মানুষ চলতে পারে না, বেঁচে থাকার জন্য একটা স্থিতাবস্থার দরকার পড়ে, বাউণ্ডুলে পর্যন্ত যেমন কখনো না কখনো বিশ্রাম নেয়, যাযাবরও যেমন তাঁবু গাড়ে। তাই সাধারণ মানুষের জীবন যাপনেও কিছু নিয়মাবলী লাগে, কিছু মান্য বিধি লাগে এবং তা মানতে তারা দ্বিধা করে না। তার থেকেই তত্ত্ব, ব্যাকরণ, বানানবিধি ইত্যাদি ইত্যাদির উৎপত্তি এবং এ মানুষে মানুষে সোশ্যাল কন্ট্রাক্টেরই অংশ; ব্যক্তি-স্বাধীনতায় তা হস্তক্ষেপ না করলে সে নিয়ে মানুষ খুশিই থাকে, নাহলে জীবন চলে না। কিন্তু সমাজ-জীবন চালানোটা হৌজ-অ্যানার্কিস্টদের উদ্দেশ্য নয়—সেটা তার কাছে প্রতিক্রিয়াশীল কাজ, ক্ষমতার চাপানো নিয়ম। কারণ সে ব্যক্তিগত যাপনে এতই মশগুল এবং সামাজিকভাবে এতই 'জিনিয়াস' (পড়ুন বিচ্ছিন্ন) যে তার এসবের দরকার পড়ে না।

তা এইসব প্রভুতা বিরাট প্রতিভা নিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে ফেলতেই যখন পারেন তাহলে সমাজ বদলাতে পারেন না কেন? এই ভাবনায় আমার অনেকগুলো বছর কেটে গেছে,

দুঃখ পেয়েছি, রেগে গেছি, বেবাক মানুষের এই বিশ্বাসঘাতকতায়, যে তারা এত প্রতিভার কথায় এতটুকু কান দেয় না বলে! ওটাই কাঁচা আঁতলামি যা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গেছে — সকলেরই যাওয়া উচিত নাহলে ইহকাল ঝরঝরে। কারণ একটা সময় দেখা যায় এইসব প্রতিভারা ঠিক খোলস ছেড়েছে এবং তাদের সেই নব-অবতার দর্শন বিশ্বরূপ দর্শনের মতোই দু-একজনের ভাগ্যে ছাড়া আর কারো থাকে না। তবে আভাস মেলে। এই যে এতএত নৈরাজ্যপূর্ণ প্রতিশ্রুতিময় কার্যকলাপ মহতী পণ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং তার একদল ভক্ত জোটানো অসম্ভব হয় না, কারণ প্রমোটার আছে। প্রমোটারেরা জানে এখানে বহুতল না হলেও চলবে, আকাশ-ঝাড়ুর দরকার নেই, দু-তিনতলার বেশি না ঝেড়ে উঠলেও চলবে। তা প্রমোটারের কাজও না বিশাল বিশাল শতায়ু বৃক্ষের জঙ্গল তৈরি করা—ওতে লাভও নেই —বরং বুনো ঝোপে অনেকখানি জায়গা ভর্তি করতে পারলে সুবিধে। এভাবে শিল্প সাহিত্য সমালোচনা, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বসভা, প্রকাশনা ও লিটল ম্যাগাজিন ইত্যাদি জায়গায় এইসব আগাছা পরগাছা জাঁকিয়ে বসল। ছোট-দোকানে এক ভাঁড় চা খাওয়ার সময় যেমন আমরা দোকানটার হুলিয়া দেখি না কিন্তু বিরিয়ানি-কোর্মা কিনতে দেখি, তেমনি এখানেও কারো গায়ে লাগে না, সামান্য ব্যবসা হল, প্রণামী জুটল কিছু আর ভক্তের নমস্কার-আদায়— এই অনেক হৌজ-অ্যানার্কিস্টদের কাছে এতটুকুও জুটবে ভাবেনি কখনো।

প্রমোটার

এই যে প্রতিভার এত দেরিতে বিকাশ ঘটল তাতে সার, জল দিল কারা? কারা সেই কাজের মহতী কৃষক? এদেরই আমি প্রমোটার বলি। না, যে বাইক-বাহনে মোটা চেন গলায় আর হাতে বালা ভেঁতা মুখের কথা মনে পড়ে প্রমোটার বললে এরা তেমন নয়। দেখতে শুনতে হাল ফ্যাশানের বিজ্ঞাপন কোম্পানির চাকুরে বা কাগজের আপিসের চতুর্থ পাতার সাব-এডিটর ধরনের কিন্তু এসব কাজে তারা মোটেও তেমন পারদর্শী হন না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বসের খিস্তি আর সহকর্মীর বিরক্তি জাগরূক করে এঁরা অবশেষে বিজাতীয় বকচ্ছপরূপী অবতার হন।

এই যে প্রতিভার এত দেরিতে বিকাশ ঘটল তাতে সার, জল দিল কারা? কারা সেই কাজের মহতী কৃষক? এদেরই আমি প্রমোটার বলি। না, যে বাইক-বাহনে মোটা চেন গলায় আর হাতে বালা ভেঁতা মুখের কথা মনে পড়ে প্রমোটার বললে এরা তেমন নয়। দেখতে শুনতে হাল ফ্যাশানের বিজ্ঞাপন কোম্পানির চাকুরে বা কাগজের আপিসের চতুর্থ পাতার সাব-এডিটর ধরনের কিন্তু এসব কাজে তারা মোটেও তেমন পারদর্শী হন না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বসের খিস্তি আর সহকর্মীর বিরক্তি জাগরূক করে এঁরা অবশেষে বিজাতীয় বকচ্ছপরূপী অবতার হন।

বাইক-বাহনে মোটা চেন গলায় আর হাতে বালা ভেঁতা মুখের কথা মনে পড়ে প্রমোটার বললে এরা তেমন নয়। দেখতে শুনতে হাল ফ্যাশানের বিজ্ঞাপন কোম্পানির চাকুরে বা কাগজের আপিসের চতুর্থ পাতার সাব-এডিটর ধরনের, কিন্তু এসব কাজে তারা মোটেও তেমন পারদর্শী হন না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বসের খিস্তি আর সহকর্মীর বিরক্তি জাগরূক করে এঁরা অবশেষে বিজাতীয় বকচ্ছপরূপী অবতার হন। মনে আশা লোকে একজন ইম্প্রেসারিও বলে জানবে, ভাববে কিংমেকার— পিছনে যদিও দালাল বা প্রমোটারই বলে এদের লোকে—সেটা তারা ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না।

এঁদের চক্করটা হল নতুন নতুন প্রতিভার আমদানি করে চমক বজায় রাখা, রোজ দিনের নতুন রগড় চাই—এখন এমন কাজের জন্য এমন সাপ লাগে যার বাহারি ফণা আছে কিন্তু ছোবল নেই, কামড় নেই। কাজেই ফসিল হয়ে যাওয়া ভাবনা-চিন্তা-কাজ এনে চমক লাগাও; বলো, অহো অহো, কী দারুণ, আমরা এতদিন এমন ভাবিইনি অথচ হাতের কাছেই ছিল। তো এই প্রত্ন-ব্যবসায়ীরা অ্যানার্কির নামে যা বিক্রি করে তা হল আরেক স্থিতাবস্থা। মাথার ভিতর সবসময়েই চলছে আহা কী লড়াই হাঁকা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে; এদিকে সে মৌতাত আড়াল করে দিচ্ছে বাস্তব—আসলে বেবাক দুনিয়ায় এমন ঘটছে না এবং যেখানে সত্যিই ঘটছে তার খোঁজে বা প্রণোদনায় একটা স্নায়ুও সাড়া দিতে পারছে না— এই হকিকতটা।

প্রমোটাররা এই নেশার কারবারি। তাদের দায় কোনো নতুন কিছুকে খুঁজে বের করা নয় বরং নতুন বোতলে পুরনো মদ ঢেলে তাকেই চালিয়ে দেওয়া। এবং এদের ব্যাপারটাও অনেকটা হৌজ-অ্যানার্কিস্টদের মতোই, আজ এ আসে তো কাল সে যায়। গত পনেরো, বিশ বছরে কতজনকে যে দেখলাম। মোটের উপর খানিক গুছিয়ে নিতে পারলে এরা সরে পড়ে অথবা তারাও হৌজ-অ্যানার্কিস্ট হয়ে যায়। তখন তাদের ভক্তকুল তাদের শিল্প, সাহিত্য, প্রকাশন গুরু, আচার্য ইত্যাদি নামে ডেকে প্রফুল্লতা লাভ করে। এখন এই ভক্তকুল কারা সেটাও এক বিচিত্র স্পিসিস। এদের নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা যাবে কোনোদিন।

এ ক রা ম আ লি

রেজারেকশন

আখলাক এইখানে শুয়ে আছে
ভাঙা হাড়ে, রক্তস্রোতে, গোমাংসের গণ-অভিযোগে

শুয়েই ছিল সে, রক্ত শুকিয়ে কালচে। এতদিন পর
কবরের নীচে যেন খুটখাট সরসর শব্দ
এক শান্তিকামী পোকা মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে সন্ত্রস্ত জানাল—

কবেকার ভাঙা সেই হাড়গোড় কাছাকাছি আসছে
পরস্পর সঙ্গী খুঁজে নিজেদের জুড়ে নিতে চায়
মাংসের কোষে কোষে কষ্টার্জিত প্রাণ
এতক্ষণে থ্যাঁতলানো চোখ হয়তো-বা পাতা ফেলছে

মাটির তলায়
পচাগলা শরীরটা গুছিয়ে নিচ্ছিল আখলাক
মাটি থেকে একদিন উত্থিত হওয়ার কথা শুনেছিল যেন
ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল সেই ভরসায়

এখন অনেক কাজ, খুঁজে বার করতেই হবে
সে-দপ্তর— যেখানে নিজের নাম, পিতৃমাতৃনাম
জন্মপরিচয় সব জমা দিতে হয়

রাস্তায় হঠাৎ ধাক্কা— আরে, সেই আখলাক না!
শালা জিন্দা কী করে হল রে?
মার ওকে

হেরোদ, এজিদ, কংস— এত এত অস্ত্রের আঘাতে
আখলাক মুখ থুবড়ে পড়ে
ফের ওঠে করজোড়ে— ভাই, ছেড়ে দাও
আমি জিন্দা নই, তবু
আমাকে যেতেই হবে এনার্সি অফিসে
বলে আসতেই হবে— এ-মাটি আমারও
না হলে যে ও-কবর আমার নিজের গোর কখনো হবে না!

সৈয়দ হাসমত জালাল

সাড়া

ভাঙা করোটির রূপ ধরে পড়ে আছে দেশ
নিঃসীম সমুদ্রকিনারে
থেকে-থেকে ঘূর্ণিবাতাস ওঠে, উড়ে যায় ভস্মকণা
বালিতে পায়ের ছাপ পড়ে থাকে শত-শতাব্দী ধরে

এইখানে একা এসে দাঁড়িয়েছি আমি
এইখানে একা এসে দাঁড়িয়েছ তুমি
চৈত্রের অবেলায়
শান্ত হলুদ আলোয় ভাসে স্বর্ণাভ মুখ
বিষণ্ণ উজ্জ্বল আকাশে কি ভেসে যায় রক্তজবা
তার পাপড়িতে নেমে আসে বাদুড়ডানার মতো
ব্যাপ্ত অন্ধকার

এই দীর্ঘ ঋতু জুড়ে আমি একা কষ্ট পাই
তুমিও কি কষ্ট পাও একা?
বেদনায় কালো হয়ে ওঠে কোটি কোটি মানুষের মুখ...
যদি হাত রাখি মাটিতে ও পাতার মর্মরে
যদি তোমাকেই ছুঁয়ে থাকি
যদি নাম ধরে ডাকি
সাড়া কি দেবে না ভাঙাচোরা অন্ধ চরাচর
সাড়া কি দেবে না বুকের স্তব্ধ জলস্রোতগুলি!

গোলাম রসুল

মেঘ বৃষ্টি ঝরিয়ে কি গান গায় আমাকে ঘিরে

যে জলধারা বয়ে যায় সন্ধ্যায় তাই দিয়ে
আমি লিখি
জলের সাগর
উত্তাল হয়েছে ডাঙা

আমি সেই দ্বীপ
ভেসে যাই চাঁদের মতো

সংগীতের সুরের মতো মেঘ বৃষ্টি ঝরিয়ে
কি গান গায় আমাকে ঘিরে
যদি ওই বৃষ্টির ফোঁটা মাটি থেকে হাত
বাড়িয়ে আমাকে ডেকে নিত
মাটির ভেতরে আপন করে রেখে দিত
আমার হৃদয়

জলময় ঝিঁঝিঁ পোকা
জোনাকির আলো
শেষ হারা কত নির্ঝর
কিভাবে পেতে সেই একটুখানি বুক
যার উপর দাঁড়িয়ে ওই বিশাল আকাশ।

তা নি য়া চ ক্র ব র্তী

কলম

না ভাঙছি না,
কিম্বা ভাঙতে পারব না
গা জুড়ে এই রং ভর্তি কাঠি

যে বল ওড়াতে পারতাম আকাশে
তা নাড়ীর মধ্যে ঢুকে কাঁদছে
যে ছবি তুলতে পারতাম আত্মার
তা মাটির তলায় হাড় গুনছে
যারা আসছে তারা কাছাকাছি শব্দ শুনছে না,
পড়তে পারছে না নিবিড় মানবিক অক্ষর
যে সুর নিয়ে খিদে ভুলে যেত
সে আজ লকারের হিসেব রাখে

তবু সবার একটা কলম আছে
কলম হল স্বপ্ন বোনার মেশিন

তবে আরো একটা টুকরো লাগে তখন,
মনের রঙে ভেজাতে হয় ধরণ
ধরণ যখন ধারণ করে
সুখরা তখন উড়ো খৈ এর ডানা...
মন তো লাগেই...মন তো আসেই
তবে মনের খবর রাখে ক'জন!
সবাই এখন ছুটছে,
ছুটছে যেন লেজের মধ্যে আগুন
ওরাও তবে মনের কাছেই আসবে
তবে কলমে সেদিন থাকবে না আর আলো
চলো, তবে আলোয় মাখাই নগর
রেখায় রাখি জোড়-বিজোড় হিসেব

একটা কলম বাঁচাব বলে
আলোর নাভি সূর্য ধরে রাখে
শব্দ না হয় নাই হল
নাই বা এল কান্না
নাই বা হল অর্থ
তুমি শুধু সঙ্গে থেকো
একখানা এই কলম ধরে
রেখার গায়ে জন্ম দিও শব্দ মাখা শিশুর

এ ন জু ল ফি কা র

নামহীন

নামহীন যে পথে থাকি
তার পাশে পাশে বেড়াচাঁপার ঝোপ
দু'চারটে নাম-না-জানা ফুল
আর
দীর্ঘ শিষের মাঝে কিছু জলজ্যান্ত বীজ—
জানি তারা একদিন মাটিকে আলগা করে
মাথা তুলে দাঁড়াবেই তেরছা আলোয়।

আর তুমি হয়তো জানো,
আমার মাথার মধ্যে রাষ্ট্রের যে দীর্ঘ বেড়া
পাশে তার কাটা কিছু হাতের মিছিল,
নামহীন—
দীর্ঘ মাইল হেঁটে গোত্র-কূল ঠিকুজির চিরকুট পায়নি যারা
নামহীন পথে তারা
আজও রোজ বাড়িটাকে খোঁজে!

সি রা জ উ দ্দি ন

বদল

কাঁচের আঙুল, জেদের বশে শরীর জুড়ে ঘাম
একটা মানুষ, ছদ্মবেশ আর একটা সর্বনাম

আবছা মানুষ নিশ্চুপ আর ধুলোজমা কিছু বই,
ঘড়ির কাঁটার মতো থেমে তো গেছেই মানানসই
ধমনী ভিখারী হয় পরাজয়ের স্পন্দন গোনে
ঢেকেই গেছে চৌকাঠ সব তৃণভোজী আস্ফালনে

সোনার কাঠির থাকে অজানা দিন মৃত্যুবার্ষিকী
বদলের পথ থেকে অগাধ বেঁচে থাকাই শিখি
ভ্যাপসা সিলিং ছুঁয়ে পরিচয়ের ঝুলন্ত ছক
খেলা হয় সারাদিন ঘুঁটি কিছু থাকে প্রবঞ্চক

অপলক রোদ শেষে বিশ্রামের কুয়াশাতে জ্বলে
সুদকষা উষ্ণতা-নীতি ইশারায় কাছে ডেকে বলে
‘এবার পথিক হও এতদিন পথচারী ছিলে
সময় গচ্ছিত ছিল হিসেব ভুলের তহবিলে’

কিছু মুখ পরিচিত নিজস্ব যাদুঘরেই ঝোলে
রুমালেতে কুড়িয়েছি সেইসব আঁচড় বদলে।
জরুরী তো পাদদেশে শুধু একা নিজেকেই শোনা
নাহলে কোথায় তুমি শঙ্কিত নিছক আবর্জনা।

নাহলে তুমিও হবে এমন-ই সস্তা আবর্জনা।

সাঈদ আনোয়ার

সরসী কড়া নাড়ে

এও এক পাতাল প্রবাস
সব সাম্রাজ্যই অন্ধকার
অনন্ত বেরঙ্ স্নেহ-প্রেম
ঊষালোকে বিমর্ষ চাঁদ
জীবন জীয়ণে এ এক কয়লা খনি।

তবু কচি হাত
গোলাপী রাঙা ঠোঁট
পৃথিবীর রক্তশিরায় দিয়েছে স্পর্শ
অক্লান্ত ফুলফুস কড়া নাড়ে
এখনও মানুষ বেঁচে আছে।

বিশ্বনাথ পুরকাইত

১

পোকাদের বাসস্থান দেখে আসি চলো, মাথা গুঁজে
কোথায় চলেছে, দু-একটা সেলাই ছাড়া এ বছর কাজ নেই,
মেজদার শালিটারও বিয়ে হয়ে গেল।

বজ্রসম্ভাষিত পাখি, মাছ, গবাদি পশুর দল
গোধূলিতে মাঠে ছিল যারা তাদের খবর নাও;
মানব জীবন বড় দায়, কীটপতঙ্গের বাসাও
চিনে রাখতে হয়।

২

তোমরা নদীর পাড়ে খেলা কর, হাসাহাসি কর
হাঙর-কুমীর দেখে; বুকের পাটা হে তোমাদের।
আমার ভাইও ছিল ডাকা-বুকো, চাঁদ দেখে, ভূত
দেখে, বাঁশবন ডুবন্ত জাহাজ দেখে
মাঝরাতে ফিরে আসত বাড়ি।

আমি অতো বীর নই বাবা, ঘরে থাকি,
মাঝে মাঝে ভাইকেই দেখি উড়ে যাচ্ছে দ্রুতগামী
তারাদের আলো মাথায় ঝিলিক মারে
সোনালি-রূপালি মাছ তোমাদের নদীতে যেমন

৩

ঊর্বশীর দাঁত দেখে আমিও হেসেছি
যদিও নাচেন তিনি ভালো
রাজা নন, সেনাপতি নন, রানিমার মন ছিল
তবলা বাদকে; তিনিই দলের অছি।

বিশ্ববন্ধু অপেরার স্মৃতি এভাবেই ফিরে আসে,
মাথার ভিতর হুহু করে গান, রমণী আহ্লাদ;
তোমাকে দেখাতে চাই মাঝিভাই তুমিই মালিক
নদী ও নৌকার। রাজনীতি ছাড়া বলো
দেশে আর কী কী আছে? পারাপার কেন
এত হিম হয়ে এল?

৪

এবার গোসাবা যাব, প্রিয়তোষ ভাই
নৌকা লাগাও ক্যানিং-এর ঘাটে,
ভূমিহীন দেবতারা ভুল ছদ্মবেশে এদিকেও ঘোরাঘুরি
করছেন দেখি; তুমি বল, ওনাদের সঙ্গে নেওয়া
সুবিধার হবে? ওনারা কি সাঁতার জানেন?

বাতাসে কমলা রঙ, মেঘ এল অসময়ে, দুর্ভাগা স্বজন
যেদিকে ঝড়ের রাত সেদিকেই কেন যেতে চাও?

গোসাবা অনেক দূর? প্রিয়তোষ, দিনে
দিনে ফিরে আসা যাবে?

শু ভ্র ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

তাদের প্রিয় কোনও বর্তমান

সারামাগো সাবধান করেছিলেন লেখায় যেন মতবাদ না আসে
আমি দেখেছিলাম রঙের উপরে পৃথিবীর
শান্ত বীজ হিংস্র দেহ খোঁজা
জিভ, যোনি, জ্বর সুদূর কোনও অভ্যাস ভাঙার শব্দে ঘুম
গ্রীষ্ম বা প্রখর নয়
খর কোনও আলো মেলে দেওয়া তালুর উপরে পাথুরে নদীর কলস্বর
খয়েরি উপলখন্ড, ভাসা শ্যাওলা আসলে প্রাচীন একটা চিৎকার
ক্রমশ ছোট হয়ে আসে বিস্তার এমনকি আঙুলও বর্ণহীন

সমস্ত দৃষ্টি আসলে রেখা, ছুরির দাগ
আমাদের জানা পৃথিবীকে টুকরো করে দিয়েছে
ধারণাচূর্ণের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসের গোলক

ভারি পুরনো স্বপ্নের উপর তাদের প্রিয় কোনও বর্তমান
জ্যোৎস্নার শিকড় তোকে কখনও গ্রীষ্মজ গ্রামের মাঠ দেখাতে পারিনি
ধুলো, একক সর্বেশ্বর
নৈঃশব্দ নামক অভ্যাসে হালকা ঢেউ
আমাদের পায়ের ধাক্কায় ঠিকরে উঠলো শুকনো ডাল
বন্ধুরা ও তাদের প্রিয় কোনও বর্তমান
এই হলুদ অ্যাসিডরঙা ছায়া
জাগিয়ে তুলছে সবকিছু
সদ্য গজানো চারা গাছ ও তার ফনা
আমরা নজর রাখছি পাতার তলায় জমা
তুলোর মত গরল
চামড়ায় লাগলেই আর রক্ষা নেই
শুধু বুঝি সমীহ-দূরত্ব ভালো
যেমন উপদ্রুত পানকৌড়ি, গোসাপ ও বাক্যবিন্যাস

কে দা র না থ সি ং

মহানগরে এক কবি

এই এত বড় শহরে
কোথাও থাকে এক কবি
কুঁয়োয় যেমন কলসি থাকে সেভাবে
থাকে
কলসিতে যেমন শব্দ থাকে
যেমন শব্দে থাকে ডানার ঝাপটানি
এত বড় শহরে ও থাকে
আর কখনও কিছু বলে না

শুধু মাঝে মাঝে
অকারণে
সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে
তারপর উঠে পড়ে
বাইরে বেরিয়ে আসে
খুঁজে খুঁজে খড়ি নিয়ে আসে কোথা
থেকে
আর সামনের পরিচ্ছন্ন চকচকে দেওয়ালে
লেখে ‘ক’

এক ছোটো
সাদামাটা ‘ক’
উঁচু শহরে বহুক্ষণ ধরে
তার আওয়াজ শোনা যায়

‘ক’ মানে কী
সেপাইকে এক বুড়ি প্রশ্ন করে

সেপাই প্রশ্ন করে অধ্যাপককে
অধ্যাপক প্রশ্ন করে ক্লাসের
সবচেয়ে চুপচাপ পড়ুয়াকে
'ক' মানে কী
সারা শহর প্রশ্ন করে

আর এই এত বড় শহরে
কেউ জানে না যে
ওই যে একজন কবি
প্রতিবার এমনি হাত তোলে
এমনিই ওই পরিচ্ছন্ন চকচকে দেওয়ালে
লেখে 'ক'
আর সবাইকে খুন করে দিয়ে যায়!

শুধু এতটুকু সত্যি
বাকি সবটা 'ধ্বনি'
অলংকার
রসভেদ
দুঃখের বিষয় হল
আমি এর বেশি ওর
সম্বন্ধে আর কিছু জানি না।

১৯৮৪ (হিন্দি থেকে অনুবাদ-সাহির জামান)

রা হা ত ই ন্দো রি

টুকরো রাহাত

সরকারের ভিখিরিপনায় করুণা আসে যে গরিবের
ঘামের উপার্জনের অংশ চায়।
শহরে বারুদের মরশুম।
গ্রামে চলো এখন পেয়ারার মরশুম।
আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ছেয়ে আছে অনেকটা
মনে হচ্ছে আর ওই লোককে পরও মনে হয়।
ওর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাও অনেক কিন্তু
যাতায়াতের খরচও মেটাতে হয় যে।
মুখ খোল, চোখে চোখ রাখ, জবাব তো দে, আমি কতবার লুঠ হয়েছি
তার হিসাব তো দে।
তোর শরীরের লেখায় চড়াই-উতরাই রয়েছে,
আমি তোকে কীভাবে পড়ব, আমাকে বই তো দে।
ফয়সালা যা কিছু হোক, মেনে নিতে হবে।
যুদ্ধ হোক, বা প্রেম হোক, ভরপুর হতে হবে।
আর বয়স যাদের পাথর ভাঙতে ভাঙতে কেটে গেছে
এখন তো তাদের হাতে কোহিনূর হওয়া উচিত।
আমি আমার প্রাণের শত্রুকে প্রাণ বলি আর
ভালবাসার এই মাটিকে হিন্দুস্তান বলি।
দেওয়ালের এই যে ঘুলঘুলি তা ষড়যন্ত্রের অংশ কিন্তু
একে আমি ঘরের আলোকবর্তিকা বলি।
যা দুনিয়ায় শোনা যায় তাকে বলে নীরবতা আর
যা চোখে দেখা যায় তাকে তুফান বলে।
আমার মন থেকে এক এক করে সব কিছু বিদায় নিয়েছে কিন্তু
একটা জিনিস বাকি আছে তাকে ইমান বলে।
শুধু ছুরিতে নয়, চোখেও জল চাই।
ও খুদা, শত্রুও আমার বনেদি চাই।
আমি আমার শুকনো চোখ থেকে রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছি আর
এক সমুদ্র বলে, আমার জল চাই।
অন্ধকার চারদিকে সাঁইসাঁই করতে শুরু করেছে।
প্রদীপ হাত তুলে দুয়া করতে শুরু করেছে।
নিয়ম শিখিয়েছিলাম যাকে চলার,
সেই লোক এখন আমাকে হেনস্থা করছে। (উর্দু থেকে অনুবাদ: জলকণা রহমান)

ক বী র দে ব
প্রা দু র্ভা ব

চতুর্দিকে চাপচাপ অন্ধকার
আর খাঁচা বন্দী মানুষের দল
পরিবার ও সঞ্চয় ঘিরে জমাট বেঁধেছে
বিপণি এখন তুচ্ছ মনে হয়
বাতাস আতঙ্কে ঘনীভূত আর ধুলোসর্বস্ব রাস্তায়
দেখেছি আশার আলো উড়ন চাকীর মত
মাথার ভিতর, যেন ফড়িঙের ডানার কল্লোল
তীব্রতর হচ্ছে আরো

এটি কোনও ঈশ্বরের অভিশাপ বা আশ্চর্য নয়

বহুকাল ধরে আমি
আমাদের বিশৃঙ্খলায় দেখেছি
জমি বা জুতোর জন্য বা শব্দের অমোঘ আকর্ষণে
কবর দিয়েছি মৃত অর্ঘ্য,
ভুলে গেছি পিতা ও পুত্রের বাক্যালাপ, মায়ের আদর

এটি কোনও ঈশ্বরের অভিশাপ বা আশ্চর্য নয়

এমন সময় অভিপ্রেত ছিল

পৃথিবীর ঘড়ি যাতে ক্লেদ ঝেড়ে ফেলে
যখন পাখিরা পুনরুদ্ধার করবে তাদের আশ্রয়
শীলমাছ নির্ভয়ে সাঁতরাবে হিমগ্ন স্রোতে
আর ভালুকেরা ফুলের নেশায় ফিরে আসবে
আজ মনে হয় এমনই হওয়ার কথা ছিল
হয়তো আমার ভুল, কিন্তু এমন চিন্তার মধ্যে
দেখা পাই আত্মবসন্তের

এটি কোনও ঈশ্বরের অভিশাপ বা আশ্চর্য নয়

কবিতা ও সঙ্গীতের নেশায় মাতাল হয়ে
চরশান্ত ঘুম নেমে আসে চোখে
আর যে ভয় তাড়া করতো কখনো আমাকে

মৃত্যুর অপ্রীতিকর পরিনাম, প্রতিশোধ মাখা
জামায় যে মন্ত্র লেখা আছে, একটি সুন্দর লাইন
বিষণ্ণ গাছের নিচে, "মুহূর্ত বিশ্বাস করে,
একদিন অসুস্থতা ভবিষ্যৎ আগলাবে"

এটি কোনও ঈশ্বরের অভিশাপ বা আশ্চর্য নয়

কোনও না কোনওভাবে
একদিন সকলেই মরে যায় প্রিয়
এবং নিজের মৃত্যু আমরা নির্বাচন করি না
কিভাবে মরণ দেখা দেবে, এবং যন্ত্রণা কত তীব্র হবে
তা কখনো কারো সম্মতির অপেক্ষা করেনি
কিন্তু আমি বেছে নিতে পারি বাঁচার উপায়
তা কখনো পূর্বনির্ধারিত নয়, আর পরবর্তী দুঃস্বপ্নে
যখন সবার সাথে দেখা হয়ে যাবে, জানি
আবার সকলে আমরা মাতোয়ারা হব উৎসবে

এটি কোনও ঈশ্বরের অভিশাপ বা আশ্চর্য নয়

সময় এসেছে
যখন মানুষ মানুষের জন্য দুশ্চিন্তায়
কিভাবে সে বাঁচবে আর নিজের শিশুকে
শেখাবে লড়াই করতে, এবং মানিয়ে নিতে
ভয়ংকর প্রলয়ের সাথে
এখন ওষুধ হয় আরেকটু নিঃশ্বাস দেবে ফুসফুসে
অথবা রক্তের নদী বয়ে যাবে অদৃষ্টের দিকে
আমাদের অর্ঘ্য তবু পারে ফিরিয়ে আনতে
আরেকটি নতুন ভোর

এটি কোনও ঈশ্বরের অভিশাপ বা আশ্চর্য নয়
শুধু বহু মানুষের উন্মাদনা-কিন্তু কেন?
শুধু আমাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য
কারা ক্ষমতায় আছে

(হিন্দি থেকে অনুবাদ: ঔরশীষ ঘোষ)

গত শতকের নয়ের দশকের প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি জয়দীপ রাউতের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রসূন মজুমদার

■ প্রথমেই জানতে চাই তোমার কবিতা লিখতে শুরু করার ঘটনা। তোমার প্রথম লেখা কবে? কীভাবে?

■■ আমার ছোটবেলা কেটেছে গান বাজনার আবহে। আমার বাড়ির সূত্রে নয়, আমার মামার বাড়ি ছিল সঙ্গীত মুখর। আমার মামা, মাসিরা গান বাজনা করতেন। বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ আর অনুষ্ঠানে গাইতেন "নাম তার ছিল জন হেনরি", "ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম" ইত্যাদি। আমি মাঝেমধ্যে সেইসব গানে অল্পস্বল্প তবলা বাজানোর সুযোগ পেতাম। আর ছিল কীর্তন। আমার মামাবাড়ির দাদুর এক বন্ধু ছিলেন, তাঁর বাড়িতেই বসত কীর্তনের আসর। আর তিনি শ্রীখোল বাজাতেন। আমি তাঁকে কীর্তনদাদু বলে ডাকতাম। এই সব গান বাজনা আমাকে প্রভাবিত করেছিল। আসলে কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে অনেক পরে, কিন্তু সঙ্গীতকে আমরা শ্রুতির ভিতর প্রায় জন্ম থেকেই পাই, পেতে থাকি। এরপর যখন একটু বড় হলাম আমার এক গায়ক বন্ধু শুভ্রকান্তি, আমায় বলল যে, আচ্ছা তুই গান লিখতে পারবি? আমি তাহলে সুর দেব। শুরু হল গান বাঁধা খেলা।

প্ল্যানচেটে শক্তি এসে আমার কাব্যগ্রন্থের নাম ঠিক করে দিয়েছিলেন

আমি তখন ওই মাধ্যমিক পাশ করেছি আর কি। গান লিখে, সুর দিয়ে বসে আছি, এমন সময় একদিন জানলাম মান্না দে কলকাতায় এসেছেন। ছুটলাম তাঁর সিমলার বাড়ি। সাহস বা মূর্খামি, যাই বল না কেন, আমরা তখন উত্তেজনায় ফুটছি। গিয়ে বললাম আমাদের তৈরি গান আপনাকে গাইতে হবে। মান্না দে কিছুক্ষণ আমাদের দেখলেন আর তারপর বললেন, তোমরা জান, আমি কে? আমরা বললাম হ্যাঁ, জানি বলেই তো এসেছি। উনি বললেন, এবার তাহলে বেরিয়ে যাও। পরবর্তী জীবনে আমার সাথে মান্না দে'র দারুণ সম্পর্ক হয়েছিল, কিন্তু সেটা অন্য কথা। সেইদিন আমরা এই ঘটনায় খুব আহত হয়েছিলাম আর আমি বুঝলাম যে, না, গানটান লিখলে হবে না। কে কবে গাইবেন, বা আদৌ গাইবেন কিনা তার থেকে কবিতা লেখার চেষ্টা করা যাক। ব্যাস।
এবার যেটা শুরু হল তা হচ্ছে কবিতা কী ও কেমন তা বোঝার চেষ্টা। খুব যে বুঝতে পেরেছি তা নয়, তবে সেই থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি বোঝার আর মাঝে মাঝে সামান্য লেখার।

■ তোমার কবিতা প্রথম কবে কোথায় প্রকাশিত হয়?

■ ■আমি যখন কবিতা লিখতে শুরু করলাম, সেই সঙ্গে শুরু করলাম কবিদের সঙ্গে মেলামেশাও। শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমায় একদিন একটা চিঠি হাতে ধরিয়ে বললেন, এটা নিয়ে তুমি আনন্দবাজারে যাও। সঙ্গে চারটে লেখা নিয়ে যেও। আমি তাতে রাজি হইনি। বললাম না, আপনার অনুরোধে কেউ আমার কবিতা ছাপবে এটা আমি মন থেকে ঠিক মেনে নিতে পারব না। যদি নিজের যোগ্যতায় কোনো দিন ছাপা হয়, হবে। এরপর স্থানীয় একটা দুর্গাপূজার সুভেনিয়রে আমার প্রথম লেখা ছাপা হয়। আমার মা বাবার খুব উৎসাহ ছিল আমার লেখালেখির ব্যাপারে। আমার মা স্কুলে পড়াতেন। বাবার ছিল দর্জির দোকান। আমার বাবা, সেই প্রথম ছাপা হওয়া লেখা দোকানের দেওয়ালে আঁঠা দিয়ে আটকে রেখেছিলেন। যাতে জামা প্যান্ট যাঁরা বানাতে আসবেন তাঁরা জানতে পারেন যে তাঁর ছেলে লেখালেখি করে, আর তা ছাপাও হয়।

■ কবিতার সঙ্গে তোমার পথচলাটা কীভাবে হয়? মানে, বলতে চাইছি তুমি কবিতার সঙ্গে কীভাবে পথ হাঁটো?

■ ■দেখো প্রসূন, আমি প্রথম জীবনে কবিতা কি জানার চেষ্টা করেছি আর পাশাপাশি লেখার চেষ্টা করেছি। আমি সেদিন হঠাৎ খুঁজে পেলাম আমার প্রাচীন অংক খাতা যেখানে তিনটি ভুল অংক আর বাকি সব কবিতা। আমি হাজার হাজার কবিতা লিখেছি আর ফেলে দিয়েছি। এই এত বছরের কবিতা চর্চায় ছাপিয়েছি মাত্র একশোটার সামান্য কিছু বেশী। কিন্তু একটা সময়ের পরে আমি খেয়াল করেছি যে এই চেষ্টা ব্যাপারটা আসে পরে। এই কাজটা অনেকটা মেকআপ ম্যানের মত। মানে নায়ক বা নায়িকা এলো। তারপর শুরু হল তাকে সাজানো। আমি তাকে সাজাতে পারলে সেই লেখা রেখেছি, না পারলে ফেলে

দিয়েছি। সিরিয়াসলি বললে, আমার কাছে কবিতা ভীষণ রকম একটা দৈব ব্যাপার। দেবী যদি কবিতা পাঠান তখন তাকে আমি অলংকৃত করেছি মাত্র। কিন্তু নিজের ইচ্ছেতে আজ অবধি একটি লাইনও আমি লিখতে পারিনি। এবার তুমি বলতেই পারো যে, দেবী যদি নিজেই তোমায় কবিতা পাঠান তো সে সব কবিতা আরো স্বর্গীয় হয় না কেন? কেন তুমি আরো ভালো লিখতে পারো না? পারলাম না, কারণ আমি ওই সাজানোটায় সেভাবে হয়ত দক্ষ হয়ে উঠতে পারলাম না বলে।

তুমি যে জিজ্ঞেস করলে কবিতার সাথে আমি পথ চলি কিভাবে, সেটা খুব সচেতন ভাবে আর আজকাল চলি না। সচেতনতা ক্ষতি করে। মাঝেমাঝে মাথায় লাইন এলে তখন সচেতন হই। নিজের মন, নিজের অবস্থান, নিজের জীবন, নিজের আনন্দযন্ত্রণা অনুযায়ী; তারপর সাজাই। তবে চেষ্টা করি সেই আনন্দ যন্ত্রণা যেন আমার একার আনন্দ যন্ত্রণা হয়েই না থেকে যায়। আর এই সাজানোর জন্যই চর্চার দরকার। দরকার সাধনার। আমি আমার মতো করে সাধনা করেছি।

■ কবিতার বলয়ে তোমার কবিবন্ধুদের সঙ্গে আদানপ্রদানের কথা যদি একটু বলো।

■ ■ তরুন বয়সে আমি গান্ধার কবিতা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। গান্ধারের প্রধান হল আমাদের অয়ন চক্রবর্তী। অয়ন প্রথম থেকেই নিজে লেখার পাশাপাশি বন্ধুদেরও উৎসাহিত করে এসেছে। এই গুণ আমার অন্য কবি বন্ধুদেরও ছিল কমবেশি। আমি মনে করি আমার কবিতার শিক্ষক হিসেবে এই কবিবন্ধুদের অবদান সব থেকে বেশী। ধরা যাক আমি যদি গান্ধারের সঙ্গে না মিশে অন্য পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশতাম তাহলে আমার কবিতা ভাবনা বা ওই যে এতক্ষণ কবিতাকে সাজানোর কথা বললাম সেটা অন্যরকম হয়ে যেত হয়তো। আমার ভাগ্য ভালো যে আমি প্রচন্ড ক্ষমতাশালী কিছু তরুণ কবির বন্ধু হয়ে উঠতে পেরেছিলাম সেদিন। কাজেই কবিতা লেখার প্রথম দিকের দিনগুলোয় আদানের দিকটা ছিলই। প্রদান কিছু করেছি বলে তো মনে হয় না। আমার প্রথম বইয়ের শেষ লেখাটার নামকরণ মনে আছে অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিল। পরবর্তীকালেও গুঞ্জাগাথার একটা লেখা ছিল, অয়ন কে শোনানোর পরে ও বলল, যে শেষ দুটো লাইন দরকার নেই। এরকম হয়েছে। একটা সময়ের পর থেকে তো আমার বন্ধু বলতে শুধু কবি আর কবি। সারাদিনে যত কথাবার্তা তাও ওই কবিতাকে কেন্দ্র করে। আমরা কিন্তু কবিতাকেন্দ্রিক জীবনযাপনই করেছি। তবে আস্তে আস্তে অনেক কবি বন্ধুর থেকেই মানসিক ভাবে দূরে সরে গেছি আমি। সেটা হয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে।

■ তোমার প্রথম কবিতার বই মাথুর। আমার মতে এটা একটা অত্যন্ত শক্তিশালী কবিতার বই। এই বই এর জন্মের ইতিহাস নিয়ে কিছু বলো।

■ ■নিজের বই নিয়ে কি বলি বলো তো? একটা বই তো একদিনে জন্মায় না। অনেকদিন ধরে জন্মায়। মাথুর আমার প্রথম বই বা পুস্তিকাও বলতে পারো। যখন বই করবার কথা

ভাবলাম, প্রথমেই ভাবলাম যথাসম্ভব ভালো লেখাগুলো নিয়েই বই হওয়া দরকার। এই ভালোর ব্যাপারটা আমার ক্ষমতা অনুযায়ী ভালো আর কি। নির্বাচন আমিই করেছিলাম। তারপর প্রশ্ন হল, কোন লেখার পর কোন লেখা সাজাবো? এই সাজানোর কাজটাও সম্ভবত বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করেই ঠিক করেছিলাম আমি। মাথুরের মধ্যে প্রেম আর অধ্যাত্মচেতনার একটা মেলবন্ধনের চেষ্টা আছে কোনো কোনো লেখায়। আমার মনে হয় সেই কবিতাই স্থায়ী যার মিধ্যে দিয়ে জীবনের মূল দর্শন বা মূল সত্যগুলি প্রকাশিত হয়। আধ্যাত্মিকতা একটা পথ সেই সত্যকে ছোঁয়ার। পেরেছি কিনা সময় বলবে।
এই মাথুর নামটি নিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে। আমার একটা নেশা ছিল মাঝে মাঝে প্ল্যানচেট করার। নানা সময় নানা জনের আত্মা ডাকার একটা নেশা ধরেছিল আমায়। একদিন মনে হল দেখা যাক শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমার ডাকে আসেন কিনা। তা, তিনি এলেন একদিন। তাঁকে একথা ওকথার পর জিজ্ঞেস করলাম যে আমার বই প্রকাশিত হবে, কি নাম দেওয়া যায়? উনি বললেন 'মাথু' রাখো। এটা কেউ বিশ্বাস করতে পারেন, নাও পারেন। কিন্তু এই নামটি আমি প্ল্যানচেটের মাধ্যমেই পেয়েছি। শক্তি আমার কলমে ভর করে এই নামটি লিখে দিয়েছিলেন। যদিও যাঁরা এই ঘটনাটা জানেন তাঁরা বলেন, যে এই নামটি আমি যে আমার প্রথম বইয়ের নাম হিসেবে রাখব সেটা নাকি আমার অবচেতনেই ছিল। জানিনা। চেতন আর অবচেতনের মধ্যে মানুষের মন তো নিরন্তর যাতায়াত করছেই।

■ মাথুর বইটিতে একটি কবিতা আছে যার প্রথম লাইনটা—সন্ধ্যায় যে ফুল ফোটে তার নীরবতা ছায়া ফেলে যেখানে আকাশ, একটি নক্ষত্রে তুমি সেইখানে স্থির হয়ে আছো। এই কবিতার জন্মকথা জানতে খুব ইচ্ছে করে। একটু যদি সেইকথা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করো।

■ ■ কোনো একটি বিশেষ কবিতা কেন লেখা হল তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, আমার মনে হয় খুব স্পষ্ট করে বলা যায় না। বিশেষত, আজ এতদিন পর যদি বলিও, বানিয়ে বলা হবে। সত্যি কথাটা হল, এলো তাই লিখলাম। আমার কেমন মনে হয় এই পৃথিবীতে যা যা হয় তা শুধু পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ নয়। মানে, ওই যে, সন্ধ্যায় যে ফুলটি এখানে নীরবে ফুটল, তা শধু এখানেই ফুটল না। তা আকাশেও ফুটল অথবা প্রতিবিম্বিত হল। ছায়া শব্দটি দূরত্বব্যাঞ্জক। আর ওই দূরের প্রতিবিম্বে একজন 'তুমি' আছো। বিরহের ব্যাপার স্যাপার, বুঝেছ তো? এর বেশী নিজেও জানিনা আমি।

■ তোমার সঙ্গে বাংলাভাষার একাধিক শ্রেষ্ঠমানের কবির ব্যক্তিগত সম্পর্ক হয়েছে,তাদের ব্যক্তিত্ব আর কবিতা তোমার লেখায় কীভাবে প্রভাব ফেলেছে?

■ ■ বাংলা কবিতায় একটা মজার ব্যাপার আছে। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ বাদ দিলে পরবর্তী কালে বাংলা কবিতাকে সরাসরি ভয়ংকরভাবে প্রভাবিত করেছেন যে দুজন কবি, তাঁরা হলেন উৎপলকুমার বসু আর জয় গোস্বামী। আমি খেয়াল করেছি যে ভাস্কর চক্রবর্তী,

গৌতম বসু, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ দাশ এঁরা সকলেই কমবেশি প্রাথমিকভাবে উৎপল অনুসারী। এঁরা অবশ্যই নিজ নিজ লেখায় প্রতিভার অধিকারী, কিন্তু ওদের প্রবাহিত নদী উৎপলদার যে গভীর প্রবাহ তার আশপাশ দিয়েই বয়ে গেছে প্রাথমিক ভাবে। বাংলা কবিতাকে উৎপল যে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, ভাবা যায় না। আমাদের ন'য়ের দশকেও সেই প্রভাব অব্যাহত।

> কবিতা লেখার সঙ্গে কবিসঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই। প্রয়োজনই নেই। কবিতা একটা নিভৃত শিল্প। ছাপার আগে অবধি অন্তত তাই।

এর পরে আসি জয় গোস্বামীর কথায়। জয় পরবর্তী বাংলা কবিতায় হাজার হাজার জয়। তবে উৎপলকে তাঁর পরের প্রজন্ম যতটা সার্থক ভাবে অনুসরণ করেছিল, জয়ের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এর কারণ হতে পারে এই যে, জয়কে যতটা ভালোলাগার কারণে তাঁরা অনুসরণ করেছেন ততটা গভীরভাবে বুঝতে পারেনি। যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করতে চেয়েছেন তাঁরা ব্যর্থ অনুকরণ করে ফেলেছেন শেষ অবধি।

খেয়াল করলে দেখা যাবে, এত যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ কবি শক্তি, তাঁর জীবন যাপন যতটা পরের কবিদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠলো ততটা কিন্তু পরবর্তী লেখালেখিতে প্রবাহিত হলেন না তিনি।

আমি শক্তি, উৎপল, বিনয়, জয়, এঁদের সঙ্গে মিশেছি এবং কবিতার পাঠক হয়ে থেকেছি। কিন্তু যে কোনো রকম সরাসরি প্রভাব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি। কতটা পেরেছি আমি জানিনা। শক্তির শব্দ ব্যবহারের যে ম্যাজিক আমাকে আকর্ষণ করেছে। উৎপলের যে শিল্পকুশলতা তা আমায় লোভ দেখিয়েছে। আমি সেখান থেকে কবিতার যে মূল মেরুদণ্ড, তাকে খুঁজে বের করতে চেয়েছি। বুঝতে চেয়েছি।

■ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের কথা একটু জানতে চাই। ওঁর কবিতা নিয়ে তোমাদের কখনও কথা হয়েছে? সেইকথা একটু জানতে ইচ্ছে করছে?

■ ■ সে তো অনেক গল্প। আমি তখন একটি পত্রিকা করব ঠিক করেছি। আমি আর আমার পাড়ার এক বন্ধু। শক্তি চট্টোপাধ্যায় নামক এক কবি এই বাংলা ভাষায় আছেন এবং তিনি বেলেঘাটায় থাকেন, এইটুকু শুধু শুনেছি। তবে তিনি কি, কেমন, কিছুই জানিনা। আমিও তখন সম্ভবত ১২ ক্লাস পাস করেছি। একদিন তাঁর বাড়ি চলে গেছি। কড়া নাড়তে একজন এসে দরজা খুলেছেন। বললাম যে একটা পত্রিকা করব, সেই ব্যাপারে কথা বলতাম, শক্তি চট্টোপাধ্যায় কি বাড়ি আছেন? কিছু উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে গেলেন। তারপর আবার বেরিয়ে এসে বললেন আমিই শক্তি। ভিতরে এস। গিয়ে বসেছি।

আমি যথেষ্ট বিস্মিত। কিন্তু তখনও বুঝিনি যে বিস্ময়ের সেই সবে শুরু। তিনি নিজে অন্য ঘরে চলে গেলেন আর কিছুক্ষণ পরে তিনি দুই কাপ লিকার চা হাতে নিয়ে এলেন আমার সামনে। বসলেন। আমি সেই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বুঝলাম যে সেই চা যথেষ্ট ঠান্ডা। তারপর, তাতে চুমুক দিতেই চমকে প্রায় ছিটকে উঠেছি। আর শক্তিও ততক্ষণে বুঝতে পেরেছেন যে কাপ বদলাবদলি হয়ে গেছে। একই রকম দেখতে দুটো কাপের একটিতে তিনি নিয়ে এসেছিলেন ঠান্ডা লিকার চা আর অন্যটিতে বাংলা মদ। আমার প্রথম মদ খাওয়া সেইদিনই।

এরপর শক্তি কবিতা দেবেন কথা দিলেন ঠিকই কিন্তু ঘোরাতে লাগলেন। যেদিন যাই সেইদিন গিয়ে বসি, চা চানাচুর খাই আর তারপর তিনি বলেন যে সামনের সপ্তাহে এসো। আবার যাই আর আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এই করতে করতে প্রায় ছমাস গেছি। তারপর একদিন একটা কবিতা দিলেন আমায়। কবিতার প্রথম লাইনটা ছিল, 'এ বৃদ্ধ বয়সে গান শুনে হয় আক্রান্ত যৌবন'। আমি আগেই বলেছি যে শক্তি কি, কেন, কেমন এ সম্পর্কে তখন পর্যন্ত তেমন ধারণা ছিল না আমার। আমি কবিতা পেয়েই অন্য একটা আবদার করে বসি। আমি বলি, যে আমি যে পত্রিকাটি করব ভাবছি আমি নিজেই তার সম্পাদক আর যদি আপনি সহ-সম্পাদক হন? আপনি রাজি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাজি। আজ ভাবলে লজ্জা লাগে, আবার আনন্দও হয়। সরলতা বা বোকামো মানুষকে কখনো কখনো ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসে।

আমি আসলে এক শান্ত শক্তিকে দেখেছি। যে বোহেমিয়ান শক্তিকে নিয়ে সবাই রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলে, তাঁকে আমি দেখিনি খুব একটা। এরপর ৪ বছর তাঁর মৃত্যুর আগে এই শহর ছাড়ার আগের রাত অবধি প্রায় প্রতিদিন তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছে। আমার প্রথম চাকরিও তাঁর দেওয়া। তাঁর জন্য যে গাড়ি বরাদ্দ ছিল, তাতেই এক সঙ্গে বহুদিন অফিস গেছি। ফিরেছি একা।

হ্যাঁ, আমার সেই অল্প বয়সের লেখা আমি তাঁকে কখনো কখনো শুনিয়েছি। তিনি মতামত দিয়েছেন। এই ভাবে চলতে চলতে আমি শক্তি পড়া শুরু করেছি আর ততদিনে শক্তি কি, কেন এই ব্যাপারটা কিছুটা হলেও বুঝেছি।

শক্তি নিজের লেখা নিয়ে কথা বলতেন না খুব একটা।

তবে মনে আছে, একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি, 'অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে।' কেন কুয়ার জল, কেন তা কুয়ো নয়? শক্তি বলেছিলেন, অই অনন্তের চাঁদ যেখানে এসে পড়বে, সেই জায়গাটা একটু প্রসারিত না হলে চলে? কুয়ো বললে কেমন ছোট ছোট লাগে। কিন্তু যেই কুয়ার বললাম, দেখ জায়গাটা বড় হয়ে গেল কেমন। এটা শোনার পর, কবিতাকে দেখার বা পড়ার তৃতীয় একটা চোখ খুলে গিয়েছিল আমার।

■ মাথুরের পরে তোমার দ্বিতীয় বই গুঞ্জাগাথা। এই বই মাথুর প্রকাশের বেশ অনেক বছর পরে প্রকাশিত। প্রথম বই থেকে দ্বিতীয় বইতে যেতে তুমি এতদিন সময় নিলে কেন?

■ ■আমি একটা টেলিভিশন চ্যানেলে চাকরি নিয়ে ঢুকলাম এরপর। ক্রীড়া সাংবাদিকতার চাকরি। রাত একটা দেড়টায় বাড়ি ঢুকতাম। তারপরে বাড়ি ফিরে হয়তো খেতে বসেছি। তখন অফিস থেকে ফোন। শোনো, তুমি কাল ভোর ৫টায় ইস্টবেঙ্গল মাঠে চলে যাও। কাল বাইচুং প্র্যাক্টিস করবেন। এটা চলতে থাকলো। একদিন হঠাৎ রাগে হতাশায় নিজের লেখা সমস্ত কবিতা, হাতের কাছে যা পেলাম ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলাম। তারপর কাঁদতে বসলাম হাউ হাউ করে। চাকরি জীবনের প্রথম দিকের ওই শাসন, ওই নিয়মানুবর্তিতা আমাকে কাজের জীবনে উন্নতি করতে সাহায্য করেছিল আর আমি শিখেওছিলাম অনেক কিছু, কিন্তু সেই সময় অসহ্যই লাগত। আমি প্রায় ১০বছর আর কবিতা লিখিনি সে ভাবে। মাথুর প্রকাশিত হওয়ার পর, শুধু ২০০৯ সালে, মনে আছে মেয়ে হওয়ার পর একটা লেখা লিখেছিলাম যা গুঞ্জাগাথার প্রথম কবিতা হিসেবে ছাপা হয়েছে। আর ওই সময়েই আরো একটা লেখা লিখেছিলাম যা ওই বইয়ের দ্বিতীয় কবিতা। এর পর আর লিখিই নি। এরপর আমি একটা সময় চাকরি ছাড়লাম। কিছু দিন চুপচাপ গিয়ে কফি হাউসে বসে থাকলাম। ওই অবসরের সুযোগে হঠাৎ আবার কবিতা আসতে শুরু করল হু হু করে। আর আমি খেয়াল করলাম যে এই লেখাগুলো খানিকটা গল্প বলার ঢং-এ আসছে। আমি দু'মাসে কফিহাউসে বসে পুরো গুঞ্জাগাথা লিখলাম। তারপর প্রায় একবছর ফেলে রাখলাম লেখাগুলো। তারপর আমার কবি বন্ধু তারেক কাজি বই করলো।

■ বিনয় মজুমদারকে তুমি কাছ থেকে দেখেছ। তাঁর কবিতা তোমায় কীভাবে ভাবিয়েছে?

■ ■বিনয় মজুমদার এক বিস্ময়কর মানুষ আর কবি। তাঁর কবিতাভাষা এককথায় অননুকরণীয়। আমরা মাঝে মাঝে যেতাম। তাঁর বাড়ি ঠাকুরনগরেও যেতাম, কলকাতার মেডিকেল কলেজেও যেতাম। ঠাকুরনগর গেলে, আমাদের কবি বন্ধু মণিশঙ্করের বাড়িতে থেকে যেতাম বা ফিরে আসতাম কলকাতায়। বিনয়দা খুব কম কথা বলতেন, কিন্তু পছন্দ করতেন আমাদের যাওয়া আসা। তাঁর সঙ্গে কবিতা নিয়ে যথেষ্ট কথা হত। মানে, আমরা জানার চেষ্টা করতাম আর তিনি দু এক কথায় উত্তর দিতেন। অয়ন, অয়ন চক্রবর্তী একদিন বলে বসল, বিনয়দা, আপনার কবিতায় জীবনানন্দের প্রভাব আপনি মানবেন? এই প্রশ্নের পর উত্তর আসবে নাকি আক্রমণ, বুঝতে পারছিলাম না। বিনয়দা হেসে বললেন, শিষ্যকে দেখে বুঝতে পারছ যে গুরু কত বড়?

বিনয়দা কত বড় কবি সেটা নিয়ে বিশ্লেষণ করার পক্ষে আমি খুবই ছোট মাপের লোক। আমি শুধু অবাক হয়ে ভেবেছি মানুষটার নিরবচ্ছিন্ন একাকীত্বের কথা। একটা ভয়ংকর অন্ধকার একাকীত্ব। তিনি একটা ঘরের ভিতর থাকতেন। যেখানে আলো নেই। পাখা নেই। আমরা সেখান থেকে সন্ধ্যা নামার আগে যখন চলে আসতাম, ভাবতাম যে এই অন্ধকার নামার পরে তিনি কি করবেন? এই যে একটা বিরাট বিপুল অন্ধকার প্রত্যেক দিন ধেয়ে আসছে, আর তার গ্রাসের ভিতর ঢুকে পড়তে হচ্ছে, এটা আমাকে ভাবাতো। বিনয়দা একদিন বললেন যে, রাত হলে তারাদের ছেলেমেয়েরা আসে। তাঁর কাছে আসে। কেন

আসে? অঙ্ক করতে। একজন কবি ও গনিতজ্ঞর কাছে কোনো মানুষ যাচ্ছেন না কিন্তু অঙ্ক জানতে। কে যাচ্ছে? তারা, নক্ষত্র, ছোট ছোট নক্ষত্রের ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে। এর থেকে বড় অসহায় একাকীত্ব আর কি হতে পারে! এই একাকীত্ব তাঁর কবিতা জুড়ে। কিন্তু কেন তিনি বড়? কারণ তাঁর একাকীত্বে আকাশ ঢুকে পড়ছে। নক্ষত্র ঢুকে পড়ছে। মহাবিশ্ব ঢুকে পড়ছে।

'সেতু চুপে শুয়ে আছে ছায়ার ওপরে'। একটা সেতু তার নিজের ছায়ার ওপর শুয়ে আছে। অঘ্রাণের অনুভূতিমালার লাইন। অয়ন বলল, এটা যৌনতার ইমেজ। বিনয়দা চমকে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু জানো তো যৌনতার কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার নেই। ভাবা যায়! আর বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই বলেই সেতু শুয়ে আছে কার ওপরে? ছায়ার ওপরে। যার আসলে অস্তিত্বই নেই।

■ কবিতার বাইরে তুমি মিডিয়ায় চাকরি করেছ, খুব ভালো কিছু সিনেমা বানিয়েছ। এই কাজগুলো তোমার কবিতাকে কী কোনওভাবে সাহায্য করেছে?

■■ না। মিডিয়ার চাকরি আমার কবিতাকে সাহায্য করেনি। কবিতার ক্ষতি করেছে। ওই চাকরি না করতে হলে আমি কবি হতাম হয়তো। আর আমার সিনেমা, মানে শর্টফিল্মও আমার কবিতাকে সাহায্য করেনি। কিন্তু কবিতা সিনেমা বানাতে সাহায্য করেছে। কবিতা অনেক বড় ব্যাপার। সিনেমা একটা যৌথ শিল্প। আমি ইচ্ছে করলে মোটামুটি ভালো মানের কিছু সিনেমা বানিয়ে যেতেই পারি, যদি ভালো একটা টিম পাই। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কবিতা লিখতে পারি না। আমি আমার সিনেমার মধ্যে দিয়েও কবিতার কাছাকাছি থাকার চেষ্টাই করেছি সবসময়।

এছাড়াও যেটা বলার তা হল আমি সিনেমা বানাতামই না হয়তো যদি কথা নন্দীর সঙ্গে আমার দেখা না হত। আমার এখন অবধি একটি ছবি বাদে সবেতেই কথা অভিনয় করেছেন। যেটায় করেননি সেটা কোনো মেয়ে চরিত্র নেই। ও একজন অসামান্য অভিনেত্রী। কবিতা যেমন অক্ষর দিয়ে লেখা হয়। শব্দ দিয়ে। কথা আমার সিনেমার অক্ষর।

এছাড়াও পবিত্র জানা, প্রমিত দাস...ওঁরা আমার সম্পাদক, ডিওপি। ওদের অসামান্য অবদান রয়েছে।

■ তোমার বন্ধুদের কবিতা নিয়ে তোমার মতামত কী? কবিতা লেখার ক্ষেত্রে কবিসঙ্গ ঠিক কতটা জরুরি বলে তোমার মনে হয়?

■■বন্ধুদের কবিতা? বন্ধুদের কবিতা নিয়ে আমি মতামত দেওয়ার কে? আমার প্রত্যেক কবি বন্ধুই নিজের মতো লিখছেন। মতামত তো পরের প্রজন্ম দেবে। সমসাময়িক লেখা নিয়ে কিছু বললে ভুল বলার সম্ভাবনাই বেশি থাকে, বিশেষত যাঁদের সাথে আমি প্রথম থেকে মিশছি। তবে একটা কথা বলতে পারি, যে আমার কবি বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ থেকে গেলেন। চিরকালের জন্য থেকে গেলেন। এর বেশী কিছু আর বলার যোগ্যতা

আমার নেই ওঁদের সম্পর্কে। কারণ আমি বিশ্বাস করি কবিতা লেখক হিসেবে আমি ওঁদের থেকে অনেক কম ক্ষমতার অধিকারী।
কবিতা লেখার সঙ্গে কবিসঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই। প্রয়োজনই নেই। কবিতা একটা নিভৃত শিল্প। ছাপার আগে অবধি অন্তত তাই। আমার বন্ধুদের বেশিরভাগ কবি বা কবিরাই ঘটনাচক্রে আমার বন্ধু, এই ব্যাপারটা আমায় প্রাথমিকভাবে এই পথে থাকতে সাহায্য করেছে। কিন্তু তার মানে এই নয়, যে কবিতা লিখতে হলে 'সৎসঙ্গ'র মত কবিসঙ্গ করতে হবে।

■ কবি জয় গোস্বামীর সঙ্গে তোমার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছে, তোমাকে কীভাবে এই সম্পর্ক কবিতায় সাহায্য করেছে?

■ ■জয় গোস্বামীর সঙ্গে আমার সান্ধ্য আড্ডা জুড়ে যতটা না কবিতা থাকে, তার থেকে বেশি থাকে গান। জয়দা একসময় সেতার শিখেছিলেন। তিনি গান-পাগল। তাঁর মত গানবোঝা লোক আমি কম দেখেছি। তিনি 'কানসেন'। এরকম সুরের কান ভাবা যায় না। আমি যাওয়ার পর জয়দা চা করছেন। আমরা তারপর এক গামলা চা নিয়ে আড্ডায় বসব। আমি গুনগুন করে গান গাইছি। জয়দা চা করা ছেড়ে ছুটে এলেন। বললেন, এই যে এই মন্দ্র সপ্তকের জায়গাটা, এটা তোমার গলায় দারুণ এল। বলেই তিনি অতুল প্রসাদ ধরলেন। জয়দা অতুলপ্রসাদের তুমুল ভক্ত।
দেখ, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের আগের কবির কাছে কোন না কোনো ভাবে ঋণী। ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য নয়। তাঁদের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের জন্য। তবে হ্যাঁ, একটা বিরাট মেধার সামনে বসলে তোমার নিজের মেধার যে জায়গাটায় সহজে আলো পড়েনি, সেইখানটা কখনো কখনো আলোকিত হয়, এটা সত্যি।

■ তুমি যেসময় জয়দার সঙ্গ করছো সেই সময়েই তোমার খুব কাছের কয়েকজন বন্ধু জয় গোস্বামীর কবিতা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে চলেছে। এই ব্যাপারটা তুমি কীভাবে দেখো?

■ ■ এই প্রশ্নটার উত্তর না দিলেই ভালো হত। জয়দার সঙ্গে আমার প্রায় ১৯৯৬ বা ৯৭ সালে একবার আলাপ হয়েছিল। আমি ডাকে দেশ পত্রিকায় কবিতা পাঠাতাম। দুবার পাঠানোর পর একটা লেখা প্রকাশিত হল। তারপর আবার পাঠালাম, আবার প্রকাশিত হল। এভাবে চলছিল। একদিন রাস্তায় আমি জয় গোস্বামীকে দেখে, তাঁর কাছে যাই। আর বলি যে আমি জয়দীপ রাউত। তিনি আমায় দেখে আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার থেকে দুটো কবিতা মুখস্ত বলে যেতে লাগলেন। সেই দুটো লেখা আমার প্রথম বইতে আছে। একটা হল দাহ, অন্যটার নাম মনে নেই...ওই যে, 'তুমি আজ ভোরে এসে যে ঘুম ভাঙাবে তার তলদেশে দ্বীপ, তন্দ্রাজল।'
আমি তো অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি রাস্তায়। কি বলব, কি করব বুঝতে পারছিনা। উনি চলে গেলেন। এর বেশি সম্পর্ক আমার জয়দার সাথে ছিল না আর তারপর থেকে কোনো

দিন দেখাই হয়নি। দু বছর আগে, আমি একদিন আমার বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, দেখি উল্টো দিক থেকে জয়দা আসছেন। আমি বললাম আপনি, এখানে? তিনি বললেন অনেকদিন হল আমি এখানেই থাকি। ব্যাস। আবার যোগাযোগ শুরু হল। আর তা নিয়মিত শুরু হল। আমি আমার অল্প বয়সে যে জয় গোস্বামীকে রাস্তায় দেখেছিলাম, তিনি তখন পরিবৃত। এবার যে জয় গোস্বামীকে দেখলাম তিনি একা, একেবারেই একা। দেশ পত্রিকার জন্য যাঁরা তাকে ঘিরে রাখতেন সবসময়, তারা কেউ নেই আর। কেউ না। এই একাকীত্বের পথ দিয়ে আমি তাঁর কাছে, খুবই কাছে পৌঁছালাম নতুন করে।

তোমার প্রশ্নের উত্তরে এত কথা বললাম এই কারণে, যে একটা সময় ছিল, তাঁকে ঘিরে থাকত তরুণ কবিদের অনেকাংশ। এবার একটা সময় এল যখন তাঁকে বিরূপ মন্তব্য শুনতে হচ্ছে তাঁর পরবর্তী সময়ের কোনো কোনো কবির কাছ থেকে। এই দুটো অবস্থার কোনোটারই কোনো মূল্য থাকা উচিৎ নয় একজন কবির কাছে।

কাজেই কে জয় গোস্বামীর কবিতা নিয়ে খারাপ বলল সে ব্যাপারে আমি কেন মন্তব্য করব, বলো? বন্ধু বা কবি বন্ধুদের কথা বলছি না, ইন জেনারেল দেখেছি, একটা আশ্চর্য ধারণা আছে যে, কেউ জনপ্রিয় মানেই সে খারাপ। ভাবটা এমন, যে যাঁরা তাঁকে জনপ্রিয় করল, তাঁরা কিছুই বোঝেন না। যেন, যিনি জনপ্রিয় তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে এসেছেন যে, আমাকে ভালো বলো, আমাকে জনপ্রিয় করে তোলো। আর যাঁকে কেউ চেনে না, আমার মত যাঁরা, তারাই আসলে মহান। জনপ্রিয়তা আর আঁতলামোর মধ্যে একটা বিরোধ আছে। আমি এমন লোককে চিনি যিনি সারাক্ষণ গুনগুন করে কিশোরকুমার গাইছেন আর কবিতা লিখছেন আখতারি বাঈকে নিয়ে। আমি এই ভন্ডামিকে ঘৃণা করি।

■ তুমি প্রধানত কী ধরনের বই পড়তে ভালোবাসো? কীভাবে অবসরযাপন করতে ভালো লাগে তোমার?

■ ■ আমি ইদানীং উপন্যাস একেবারে পড়ি না। কবিতার বাইরে, ছোটগল্প খুব পড়ি। আর আধ্যাত্মিক বইপত্রের প্রতি ঝোঁক আছে। পারলৌকিক বইপত্রের প্রতি নেশা আছে আমার। অবসরে বই পড়ার পাশাপাশি অনেকসময় একদম চুপ করে বসে থাকি। একটাও কথা না বলে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে পারি। ইদানীং সেটাই থাকি বেশি। আর হ্যাঁ, গান শুনি। সঙ্গীত আমাকে শান্তি দেয় কিছুটা। আমার গান শোনার বিরাট পরিধি। কিশোরকুমার থেকে রামকুমার। বড়ে গোলাম আলি থেকে গোলাম ফকির।

■ তোমার আপাতত শেষ বইটা অপরূপ কথাখানি। এই বইতে অসাধারণ সব প্রেমের কবিতা আছে। এই বইএর কবিতা লেখার নেপথ্য প্রেরণার কথা জানতে চাই।

■ ■ অপরূপ কথাখানি'র মধ্যে আমার নিজের অসহায়তার কথা, আর একটি মেয়ের পাগলের মতো ভালোবাসার কথা আছে। কবিতা, বিশেষত প্রেমের কবিতার ভিতরে যদি কখনো সরাসরি কোনো নারী থাকেন তবে আমি বলব পাঠক তাঁকে খুঁজে বের করুক। তিনি

৬ প্রেম বলতে নায়ক নায়িকার যে কনসেপ্ট আছে, আমার সেরকম নয়। রূপকথার রাক্ষস আর রাক্ষসের সঙ্গে থাকা রাজকন্যার যে প্রেম, আমার সেরকম।

বইয়ের নামকরণ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কবিতার ভিতরে, সর্বত্রই তো আছেন। আমি যদি গোটা গোটা অক্ষরে তাঁর নাম বলে দিই তাহলে কবিতা তার রহস্যময়তা অনেকটাই হারাবে। তখন কবিতা নয়, মেয়েটিই কোনো দুর্বল পাঠকের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠবে। শুধু একটা কথা বলি, তিনি আমার কাছে সমস্ত অর্থে অপরূপ। শুধু কবিতার প্রেরণা নয়, তিনি আমার কাছে আরো বড় কিছু।

■ কবিতার বাইরেও বহু বিখ্যাত মানুষের সঙ্গ করেছ তুমি, তাদের প্রভাব তোমার জীবনকে কতটা আলোড়িত করেছে?

■■ আমার সৌভাগ্য যে আমি ক্রীড়াজগৎ থেকে শুরু করে সঙ্গীতজগতের অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্বকে কাছ থেকে দেখেছি। আমি প্রথমে, মান্না দের কাছে গিয়ে ঘাড় ধাক্কা খাওয়ার কথা বললাম না একটু আগে। অল্প বয়সে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম... পরবর্তীকালে কিন্তু তাঁর সাথে আমার দারুণ সম্পর্ক হয়। আমি তাঁর বিখ্যাত সব গান তাঁর গলায় পাশে বসে শুনেছি। সেটা একটা লাইফটাইম অভিজ্ঞতা। মান্না দের বাইরেটা ভীষণ রুক্ষ। কিন্তু মনটার তুলনা নেই। তাঁদের সময়ের কত গল্প শুনেছি আমি তাঁর কাছ থেকে। কিশোরকুমার, রফি সাহেব, শচীন কর্তার কত যে গল্প। মান্না দে-কে এক দিন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার মতে, প্লে ব্যাক সিঙ্গারদের মধ্যে সেরা তিনজনকে বেছে নিতে বললে আপনি কাকে বাছবেন? মান্না দে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, যে আমি সবার ওপরে রাখব রফি সাহেবকে। তাঁর থেকে মাত্র এক ইঞ্চি নিচে কিশোর। তারপর মান্নাজ্যেঠু আবার চুপ। আমি বললাম, আর তৃতীয়? তিনি বললেন ওটা তুমি নিজে বেছে নাও। ভিতরে ভিতরে এত রসিক আর এত বড় মনের মানুষ আমি কম দেখেছি। আজকে তুমি কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখ? সে বলবে যে সে-ই সেরা। কবিতার জগতেও তাই-ই চলছে।

আসলে আমি অনেক কিছু শিখেছি এই কবিতার বাইরের বিখ্যাত বা গুনী মানুষগুলোর কাছ থেকে। শানুদা, মানে কুমার শানুর ব্যক্তিজীবনে তখন ঝড় চলছে। এদিকে একটা আপাত তরল বা চটুল গান গাইতে হবে তাঁকে। আর সেই গানের কথা আর সুর দুটোই আবার আমার। আমি জানি শানুদা কি সমস্যার ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন। আগেরদিন রাতে সে সব বলছিলেন আমাকে হোটেলের ঘরে বসে। এবার তিনি রেকর্ডিং-এ এলেন। গানটা শুনলেন, নিজে হাতে লিরিকটা লিখলেন। দু'বার গুনগুন করে গাইলেন আর তারপর মাত্র ১৫ মিনিটে রেকর্ডিং শেষ করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, এই কঠিন মানসিক অবস্থার মধ্যেও গানের মধ্যে এত প্রাণ প্রাচুর্য

আসে কি করে? শানু দা স্টুডিওর বাইরে লাল আলোটার দিকে দেখালেন আমাকে। বললেন, ওই যে আলোটা দেখছিস, ওটা যেই জ্বলে উঠল, অমনি আমি আমার গায়ক সত্তাটুকু রেখে জীবনের বাকি সব কিছু ওই দরজার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

■ তুমি বলো যে তুমি অলৌকিক পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। ভূত এবং ভগবান সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী?

■ ■ না না। আমি ভুত বা ভগবান কারো সঙ্গেই যোগাযোগ করতে পারি এরকম কখনো বলিনি। আমি কি ওঝা বা তন্ত্রসাধক নাকি! আমি এই সমস্ত বিশ্বাস করি। যাঁরা বলেন, যে ঈশ্বর নেই বা অলৌকিক কিছু হয় না আমি তাদের সঙ্গে সহমত নই। একটা থালা বা প্লেটে পাউরুটি নেই। এটা আমি বলতে পারছি। কেন বলতে পারছি? কারণ আমি পুরো থালা বা প্লেটটাকেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ঈশ্বর নেই কি করে বলি? এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের আমি কতটুকু জানি? জানি না। কিন্তু টের পাই। ধারণা পাই। তবে এই ধারণা বা বিশ্বাস একই থাকলেও মান্যতা কখনো কমে কখনো বাড়ে। মানে আমি জানি যে বাড়িতে বাবা আছেন। কিন্তু সব সময় কি তাঁকে মেনে চলি? চলি না তো? সেরকমই। আমার বাড়িতে রাধাকৃষ্ণ আর আমি এক ঘরেই থাকি। মানে ঠাকুরঘরটর নেই। সেই রাধামাধবের মূর্তি আমি কখনো সাজাই নিজে হাতে, কখনো আবার তাকিয়েও দেখিনা দিনের পর দিন। এভাবেই চলতে থাকে।
একটা সময় আমি খুব স্বপ্ন দেখতাম। খুব আশ্চর্যের বিষয় হল যে আমি কৃষ্ণমুগ্ধ লোক। কিন্তু দিনের পর দিন আমি শুধু কালীর স্বপ্ন দেখেছি। সেই স্বপ্নগুলো অদ্ভুত। যাই হোক। এটা আমাকে ভাবাতো। সারাদিন শ্রীকৃষ্ণের কথা ভাবলাম আর স্বপ্ন দেখলাম কালীকে! একদিন হঠাৎ ভবা পাগলার একটা গান শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। গানটার বক্তব্য হল, তুমি যদি কৃষ্ণ ভাবো, কালী তোমায় পথ দেখাবে। এই গানটা থেকে আমি আমার স্বপ্ন সম্পর্কে একটা ধারণা পেলাম। আমার মনে হয়, ঈশ্বরের জন্ম বিস্ময় থেকে। আর ঈশ্বরের পূর্ণতা বিশ্বাসে।
এবার আসি ভূতটুতের ব্যাপারে। মৃত্যুর পরে কিছু আছে? এই প্রশ্ন আমার একার নয়। অনন্তকাল ধরে মানুষ জানতে চাইছে। আমার জীবনে অনেক অলৌকিক অভিজ্ঞতা আছে। এখানে সবগুলো বিস্তারিত ভাবে বলা মুশকিল।
শুধু একটা ঘটনা বলি। আগেও এই গল্প আমি অনেককেই বলেছি। আমি তখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। আমার মা বাবা দুই মাসি মামা ও ভাইবোনেরা গোয়ায় গিয়েছি ঘুরতে। আঞ্জুনা বিচের পাশে একটি সম্পূর্ণ বাড়ি আমরা ভাড়া নিয়েছি দু'তিন দিনের জন্যে। বাড়ির মালিক পাশেই আরেকটি বাড়িতে থাকেন। প্রথম রাত্রে, সারাদিন ঘোরাঘুরির পর আমি একটা কাগজ আর পেন নিয়ে কিছুক্ষণ আঁকিবুঁকি কেটেছি। এঁকেছি একটি অল্পবয়সী ছেলের ছবি। আঁকার পর আমি সেই ছবি পাশের টেবিলে দাঁড় করিয়ে রাখি। তারপর খাওয়া দাওয়া, আড্ডা শেষে ক্লান্তির ঘুম। আমি শুয়েছিলাম আমার মায়ের পাশে। তাঁর পাশে পরপর দুই মাসি। বাইরে অনেক রাত অবধি মামা মেসো বাবা তাস খেলছিলেন। অন্য ঘরে বোনেরা ও দুই মামি।

মাঝরাতের দিকে স্বপ্ন দেখি একটা বাচ্চা ছেলে সেই ঘরেরই লাগোয়া বাথরুমের দরজা খুলে সোজা আমার মায়ের মাথার সামনে দাঁড়িয়েছে। ঘুম ভেঙ্গে যায় মাসির গলার আওয়াজে। মাসি ব'লে ওঠেন দিদি, তোর মাথার কাছে কে?

জানা যায়, যে স্বপ্ন আমি দেখেছি, সেই স্বপ্ন একই সঙ্গে দেখেছেন সকলেই। এবং একই ভাবে। অর্থাৎ আমি যখন দেখছি ছেলেটি মায়ের মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, মাসিরাও তাই দেখছেন।

এরপর ভয় ও বিস্ময় সামলে আমরা আবারও ঘুমানোর চেষ্টা করি এবং ঘুমিয়েও পড়ি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবারো স্বপ্নে বাথরুমের দরজা খুলে যায় আর বেরিয়ে আসে সেই ছেলেটি। এবার সে ছোট মাসির পা'য়ের সামনে দাঁড়ায় এসে। দেখতে থাকে নবাগত অতিথিদের। এরপর আর ঘুমানো যায় না। সবাই বাইরে, বাইরের ঘরে বেড়িয়ে আসি। ছোট মামা বললেন আমি শুচ্ছি ওই ঘরে, তোরা বাইরের ঘরেই শুয়ে পড় দেখি। তারপর মামা ঘন্টাখানেকর মধ্যে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে, বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে, মেইন দরজা খুলে সোজা গিয়ে কড়া নাড়লেন মালিকের বাড়ি। গোয়ার আকাশে, আঞ্জুনা বিচের ঢেউয়ে ঢেউয়ে তখন ভোরের আলো সবে মাত্র পাল তোলা নৌকার মত দুলে উঠতে শুরু করেছে। আমাদের যিনি ঘর ভাড়া দিয়েছিলেন তিনি বেরিয়ে এলেন। এসে বসলেন, যে বাড়ি তিনি আমাদের ভাড়া দিয়েছিলেন তার বাইরের ঘরের চেয়ারে। সব শুনলেন। তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। বললেন, আমার মনে ছিল না এই তারিখটা। গতকালই ছিল সেই দিন। আজ থেকে কয়েক বছর আগে, যেখানকার চটি খুব বিখ্যাত সেই কোলাপুর থেকে একটা বাচ্চা এসেছিল ওঁর কাছে। তখন ওঁরা এই বাড়িটাতেই থাকতেন। ছেলেটি দৈনন্দিন কাজে নিযুক্ত হয় এই বাড়িতেই। কিন্তু একদিন তার গায়ে আগুন লেগে যায় আর সে বাঁচবার জন্য জ্বলন্ত অবস্থায় ওই বাথরুমে ঢোকে। কিন্তু আর বেরোতে পারেনি। কাল ছিল তার মৃত্যু দিন।

আমি একদিন উল্টো দিক থেকে ভাবছিলাম। যদি সব কিছু মুছতে মুছতে যাই প্রসূন। ধর, পৃথিবীটা মুছে দিলাম। সব গ্রহ তারা মুছে দিলাম। কী থাকে? যা থাকে, তাও মুছে দিলাম। এভাবে মুছতে মুছতে যখন কিছুই থাকল না, তখন সেই না থাকাটা কোথায় থাকে? আসলে না থাকা বলে কিছু নেই। ঈশ্বর আছেন, আমিও হয়তো থাকছি মৃত্যুর পরে।

■ তোমার সময়ের কবিদের কবিতা নিয়ে তোমার মতামত কী? তোমার বন্ধুবৃত্তের বাইরে যারা তোমার সমসাময়িক কবি তাঁদের মধ্যে কাদের কবিতা ভালো লাগে তোমার?

■■ দেওয়ালে টাঙানো ছবি যেমন একটু দূর থেকে দেখতে হয়, তেমনি আমার সমসময়ের কবিতাকেও যাঁরা একটু দূর থেকে দেখবেন এই মূল্যায়নটা তাঁদের পক্ষে করা ঠিক হবে। তবে এইটুকু বলতে পারি ৯এর দশক বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য দশক। আরো উল্লেখযোগ্য হল এই দশকের একদম প্রথম দিকে যে সব কবিদের জয়ধ্বনি আমরা শুনেছিলাম তাঁদের অনেকেই কিন্তু শেষ অবধি মিলিয়েই গেল। আর যাঁরা সেই সময় প্রায় নেই হয়ে ছিল তাঁরাই মূলত লিখল প্রকৃত কবিতাটা। মন্দিরের মাথায় পতাকা উড়তে দেখেছ কখনো? একে সে

মন্দিরের মাথায় অবস্থিত, তার ওপর প্রবল হাওয়া। আমি খেয়াল করে দেখেছি, বিভিন্ন মন্দিরের শীর্ষপতাকার আকাশ ছোঁয়া দম্ভ। তো হল কি, সেই পতাকা উড়ল, কিন্তু কোথাও পৌঁছাতে পারল না। আর পাখিও উড়ল এবং কোথাও পৌঁছাল। আমার সময়ের কবিদের কেউ কেউ ওই পতাকাটির মতো উড়েছিল, কেউ কেউ স্বাধীন আর স্বেচ্ছাচারী পাখির মত। কবিতার অনেক পথ আছে। অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা শোভন ভট্টাচার্য ধ্রুপদী সেতার বা সরোদের মতো বেজে ওঠেন। আবার তুমি যদি অয়ন চক্রবর্তীকে দেখ, দেখবে হাল্কা চালে অনেক বড় কথা বলার ক্ষমতা রাখেন অয়ন। অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর বাগচি, সার্থক রায়চৌধুরী, এঁরা খুব ক্ষমতাশালী। বিপ্লব চৌধুরী তো কবিতাটা সঙ্গে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছেন। মণিশঙ্কর বিশ্বাসের উপমাশক্তি আমাকে বিস্মিত করে। এছাড়াও সুদীপ্ত চক্রবর্তীর লেখা আমার বেশ ভালো লাগে। তবে এভাবে নাম ধরে ধরে না বলাই ভালো। আমি খুব কাছ থেকে যাঁদের দেখেছি তাঁদের নাম উল্লেখ করলাম মানে এই নয় যে যাঁদের নাম বললাম না তাঁদেরকে আমি খারাপ বলছি।

■ তোমার জীবনে তো একাধিক প্রেম এসেছে। প্রেম বলতে তুমি ঠিক কী মনে করো? প্রেম কীভাবে তোমাকে কবিতা দিয়েছে একটু বলো।

■ ■ হায় ঈশ্বর! এর কি উত্তর দেব? প্রেম কি বলো তো? প্রেম হচ্ছে একটা প্রিয় আয়না। মাঝে মাঝে যার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে ইচ্ছে হয় অথবা আয়না আমাকে কি ভাবে দেখছে, সেটা বুঝে নেওয়াই প্রেম। রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে না, 'কে মোরে ফিরাবে অনাদরে, কে মোরে ডাকিবে কাছে, কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে'। এই 'প্রেমের বেদনা'টা দারুন একটা বিষয়। কার প্রেমের বেদনায় আমি জাগ্রত, এটা আমারও জানতে ইচ্ছে করেছে, জেনেওছি।

হ্যাঁ, আমার জীবনে অতুলনীয় আর অনিয়ন্ত্রিত প্রেম এসেছে। কবিতাও এসেছে স্বাভাবিক ভাবে। তবে প্রেম বলতে একটা নায়ক নায়িকার যে কনসেপ্ট আছে, আমার জীবনে প্রেম সেরকম নয়। বরং আমার মনে হয়, রূপকথার রাক্ষস আর রাক্ষসের সঙ্গে থাকা রাজকন্যার যে প্রেম, আমার সেরকম। আমার তৃতীয় বইয়ের শেষ লেখাটায় সে কথা বলা আছে—

সে যদি জিজ্ঞেস করে আমি/কে হই তোমার/তুই বা কে হোস?
বোলো তাকে তুমি হও অপরূপকথাখানি আর/আমি হই তোমার রাক্ষস

■ তোমার পরবর্তী কবিদের নিয়ে তোমার ভাবনা কী? তাদের কবিতা তোমার কেমন লাগে?

■ ■ আমাদের পরবর্তী, যাঁরা লিখতে আসছেন তাঁদের অনেকেই সত্যি ভালো লিখেছেন এবং আরো ভালো লিখবেন। তবে এই বিশ্বাসের পাশাপাশি একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করি ইদানীং। আমি ফেসবুকে কত যে কবিকে দেখি যাঁরা কি লেখেন, কেন লেখেন, বুঝতে পারিনা। আর তাঁদের এই অল্পবয়সেই একেকজনের প্রায় আট ন'টা বই। এখন ফেসবুক হল এমন একটা দেওয়াল যেখানে কবিতা টাঙাতে গেলে কোনো সম্পাদকের প্রয়োজন হয় না। আর বিস্ময়কর ব্যাপার যেটা, সেটা হল তাঁরা তাদের কবিতায় হাজার হাজার লাইক পাচ্ছেন। ধরা যাক কেলাস

বর্মন বলে কেউ কিছু লিখলেন। এই নামটা বানালাম আর কি। তো, তিনি লিখলেন। কিন্তু যা লিখলেন তার মাথামুণ্ডু নেই, অথচ হৈ হৈ করে লাইক পড়তে লাগল। তিনি ভাবলেন, তিনি তাহলে ভালোই লেখেন। আর যে নতুন ছেলেটি ভালো লিখতে শুরু করেছেন, ধরা যাক তার নাম অর্ণব চৌধুরী, তিনি যখন দেখলেন যে তাঁর কবিতায় তেমন কোনো লাইক নেই তিনি কিন্তু মনে মনে মুষড়ে পড়লেন। এই মুষড়ে পড়াটা যেন না আসে।

■ তোমার নতুন লেখা বা নতুন বই নিয়ে কী ভাবছ?

■ ■ লেখার ব্যাপারটা যেহেতু অনিশ্চিত এবং আমি যেহেতু ইচ্ছে করলেই কবিতা লিখতে পারিনা, তাই আগাম ভাবনা কিছু নেই। আমি এমনিতেই এত কম লিখেছি! আমার মতো কম খুব কম জনই লিখেছেন। আমার এযাবৎ প্রকাশিত লেখা মাত্র একশোটার মতো। আগামি দিনে কি লিখব, বা আদৌ লিখতে পারব কিনা কবিতার দেবীই জানেন। কিন্তু যেটা হয়েছে তা হল ২০১৮য় একটা শ্যুটিং করতে গিয়ে আমার ডান হাতের তর্জনী প্রায় দু'টুকরো হয়ে যায়। তখন একটা অভূতপূর্ব সময় উপস্থিত হয় আমার জীবনে। ভয়ংকর যন্ত্রণা। আমি ব্যথার ওষুধ আর নানা রকম ঘুমের ওষুধ খেয়েও ঘুমাতে পারতাম না। আমি রাত দশটা নাগাদ ঐসব ওষুধগুলো খেয়ে, জানলার ধারে বসে ছটফট করতাম সারা রাত। ওই সময় হঠাৎ যেটা হল কবিতা আসতে শুরু করলো আমার কাছে। কিন্তু লিখব কি ভাবে? আমি মনে মনে লেখাগুলো তৈরি করতে শুরু করলাম আর সেগুলো জানাতে থাকলাম কথাকে। কথা আমার সেই সব লেখা ওঁর বাড়িতে বসে খাতায় টুকে রাখতে শুরু করল। এদিকে আমি রাত জাগছি যন্ত্রণায়, রাত জাগছি নতুন কবিতায়, ঐদিকে কথা রাতের পর রাত জাগছে সেগুলো লিখে রাখার জন্য। দূরে থেকেও অসম্ভব কাছে থাকা বলতে যা বোঝায়, সেই দিনগুলোয় সেইভাবে পাশে থেকে সাহায্য করে গেছেন কথা। আমি তিন মাসে প্রায় আড়াইশ কবিতা লিখেছি ঐ সময়। সব যে গ্রহণযোগ্য, তা হয় তো নাও হতে পারে, কিন্তু লিখেছি। আর তারমধ্যে ৫০টা লেখার বিষয় আমার ঐ কাটা আঙুলটা। এছাড়াও আরো অন্যান্য কবিতাও আছে। সেসব নিয়ে বই হবে হয়তো কখনো। আপাতত শীতলার গাধা নামে দশটা কবিতার একটা সিরিজ লিখেছি। বই হিসেবে প্রকাশ পাবে।

■ পরবর্তী কবিতালেখকদের তুমি কী বলতে চাও, এই প্রশ্ন দিয়েই আমাদের কথোপকথন শেষ হোক।

■ ■কিচ্ছু না। আমি কি বাংলা কবিতায় ধর্মযাজক নাকি যে পরবর্তী কবিতা লেখকদের কিছু বলব! আমার সেই যোগ্যতা নেই।

মুসা আলি
বনবিবি

[পূর্বসূত্র ঃ– জঙ্গলী আর দিনুর হাতে দক্ষিণ রায় বেদম মার খাবার পরে মা নারায়ণী ভীষণ হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন, কিন্তু একেবারে ভেঙে পড়েন নি। ডাকু নামের এক কালো মানুষকে ঠিক করেছেন জঙ্গলী আর দিনুর পৃথক হয়ে থাকার অবস্থান জেনে নিতে। তাঁর স্থির বিশ্বাস, প্রকৃত তথ্য পেলে ছেলে দক্ষিণের পক্ষে সম্ভব নতুন এ বিড়ম্বনা সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলতে। ডাকু কী পারবে সেই কূটনীতিতে সার্থক হয়ে উঠতে? ভিতরে ভিতরে দক্ষিণ রায়ের পক্ষে থেকেও বনবিবি, জঙ্গলীর কাছে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভূমিকা পালন করতে হবে। ভীষণ দায় তার মাথার উপরে। সাফল্য পেলে মা নারায়ণী তাকে একশ বিঘে ভূমি উপহার দেবেন বলেছেন। লোভে ভারী লোহা বহনের দায়ভার মাথায় নিয়ে দুরকম ভূমিকা পালনে লেগে পড়েছে ডাকু। জঙ্গল জীবনের প্রাচীন কূটনীতি জানতে আপনাকে অবশ্যই পড়তে হবে এ সংখ্যার অংশটুকু।]

৮ : শেষ অংশ

পা চালিয়ে সামনে চলার গতি দ্রুততর করে তুলল ডাকু। একটা কঠোর বাস্তববোধ তার মনের পাতায় বার বার ভেসে উঠছে। মা নারায়ণী নিজের মুখে যে একশ বিঘে জমি উপহার দেবার কথা বলেছে, পরে পরে তা নিশ্চয় না বলতে পারবে না। না বলার মতো তেমন কিছুও নেই, সমগ্র সুন্দরবন জুড়ে যে হাজার হাজার বিঘে ভূমি রয়েছে, তা থেকে মাত্র একশ বিঘে জমি দেবে তাকে।

তবুও তাৎক্ষণিক ভারসাম্যে ডাকুর হৃদয়ের তলানিতে সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। একবার ভাবল, সবচয়ে আগে নিরিবিলি বিলে জঙ্গলীর সাঁতার কাটার খবর মা নারায়ণীকে জানানো প্রয়োজন, কিন্তু একশ বিঘে জমি-প্রাপ্তির মোহ সেই মানসিক তাগিদকে কেমন যেন আলগা করে দিতে থাকল। তাকে কোথা থেকে সেই প্লট দেওয়া হবে, তাও জানিয়ে দিয়েছে মা নারায়ণী। সেই প্রত্যাশা দ্রুততালে ডাকুর মধ্যে সমুদ্র হয়ে উঠছে। জীবনে প্রত্যাশার পারদ এমনিই। একবার মাথা ঝাঁকিয়ে ডাকু আপন মনে বলল, যাই, নিজের পাওনা জায়গাটুকু একবার দেখে আসি।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। গভীর জঙ্গলের ভিতরে পূব পশ্চিমে চলে যাওয়া স্রোতস্বিনীর পাড় ধরে এগিয়ে চলল ডাকু। বুকের ভিতরে প্রাপ্তির মোহ এত তোলপাড় শুরু করেছে যে কিছুতেই নিজেকে শান্ত করে রাখতে পারছে না সে। লম্বা লম্বা পা ফেলে মা নারায়ণীর প্রস্তাবিত প্লটটার কাছে পৌঁছে গেল। একশ বিঘের মধ্যে দশ বিঘে জলাশয়। বেশ স্ফটিক জল। ডাকুর মধ্যে একটা নতুন ছন্দদোল ক্রমে উর্ধ্বগতি হয়ে উঠছে। সাঁতার দেওয়ার জন্য জঙ্গলীকে কী এখানে টেনে আনা সম্ভব? সত্বর কাজটা সারতে পারলে তার জমি পাওয়াও কাছে আসবে। কিন্তু—এক অদ্ভুত দোলাচলের মধ্যে ছ্যাৎ শব্দের হুল্লোড় শুরু হল বুকের গভীরে। প্রস্তাব শুনে জঙ্গলী কোনোরকম সন্দেহ করবে না তো? বনবিবির কানে গেলে তা নতুন মোড় নেবে নাতো?

ডাকু মাথার উপর ডান হাতের তালু রেখে পাথরবৎ দাঁড়িয়ে থাকল। কেমন যেন আবেগের স্রোতে একুল সেকুল হতে হচ্ছে তাকে। অনুভূতি আর বাস্তবতার দ্বন্দ্বে ভয়ানক দীর্ণবিদীর্ণ হতে থাকল। অবশ্য ছলে বলে টেনে আনতে পারলে রায়বাঘ অতি সহজে জঙ্গলীকে শেষ করে দিতে পারে।

ভিতরে ভিতরে দুলতে দুলতে ডাকু নিজের পাওনা হতে যাওয়া বড়ো বিলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল। বেশ লাগছে। তুলনার দ্যুতিতে অভিনব আন্দোলন শুরু হয়েছে ডাকুর হৃদয়ের তলানিতে। দিব্যি এ বিলে মাছ ফেলে বড়ো হলে তা বিক্রি করে কিছু রোজগার করতে পারবে সে। সহজে নিজের সংসারটা গুছিয়ে নেওয়াও সম্ভব। তার জীবনে হঠাৎ করে যে এত বড়ো সুযোগ চলে আসবে, আগে তা কোনোদিন ভাবতে পারেনি ডাকু। সেটাই এখন তার কাছে কঠোর বাস্তব হয়ে উঠছে। একটা ধোঁয়াশা প্রশ্নের

দোল এক ঝলক ছুঁয়ে গেল। বিল থেকে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করার জন্যে কী মা নারায়ণীর সম্মতি নিতে হবে?

নতুন দোলাচলে দুলতে লাগল ডাকু। সম্মতি নিতে হলে তাতে তার মালিকানা বলে কিছুই থাকবে না। পাওনা হয়ে যাবার পরে মা নারায়ণীর সম্মতি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বলেই ভাবতে পারল ডাকু। নিজের জমিজিরেত মানে নিজের মর্জিমাফিক তা ভোগ করার অধিকার লাভ করা। সেখানে নারায়ণীর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার কোনো মানে হয় না।

সূর্যের তেজ গণগণে হয়ে উঠেছে। দুপুরের খিদেতে ডাকুর পেট জ্বলছে। ভাবল, প্রস্তাবিত প্লটের উপরে বড়ো হয়ে ওঠা গাছের ফলমূল খেয়ে দিব্যি এ সাময়িক খিদে দূর করতে পারবে। কোনোরকম বিলম্ব না করে সেই চেষ্টায় ঢুকে পড়ল। প্রথমে একটা মধুর চাক ভেঙে বেশ কিছুটা মধু সংগ্রহ করে নিল। সামনে সরে গিয়ে দেখল, গাছে লিচু ঝুলছে। তলাতে আনারসের চাক গড়ে উঠেছে। মধু, আনারস আর লিচু—হৃদয়ভরে গ্রহণ করল ডাকু। মালিকানা প্রাপ্তির মোহ তার সমস্ত অন্তরজুড়ে। সূর্যের আলো বড়ো বড়ো গাছের ঝোপঝোপ পাতার ফাঁক গলে মাটির বুকে নেমে এসেছে। এক অদ্ভুত মোহময় পরিবেশ। আবেশে মন ভরে উঠছে ডাকুর। অপার আনন্দে এদিক সেদিক করতে লাগল। আবার বিলের পাশে গিয়ে বসল। মা নারায়ণী যে প্লটটা কেবল তাকেই দেবে, কদিন থেকে সেই বিশ্বাস তার মধ্যে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে উঠেছে। রায়বাঘের জন্যে যে খবর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে, তা শুনলে মা নারায়ণী অভিভূত না হয়ে পারবে না। পশ্চিমের আকাশ বেয়ে সূর্য নামতে শুরু করেছে। কিন্তু তার প্রত্যাশার সূর্য পাল্লা দিয়ে উপরে উঠছে। ডাকু অস্ফুটে বলল, না, আর দেরি করা ঠিক হবে না। যাই, মা নারায়ণীকে গিয়ে জঙ্গলীর নিরিবিলি বিলে সাঁতার কাটার খবরটুকু দিই গে।

তবুও একটা দ্বিধা কেন যে সন্দেহের মেঘ হয়ে জমে উঠছে তার মনের আকাশে। আগে সে কখনো জঙ্গলীকে খালি চোখে দেখেনি। এত প্রকাণ্ড বুকের ছাতি? পঞ্চাশ ইঞ্চিরও বেশি। একেবারে পেটা শরীর। সাত ফুটের মতো লম্বা। অভিনব পুলক আর বিহ্বলতার সংমিশ্রিত নতুন অনুভূতিতে দোল খেতে লাগল ডাকু। সুন্দর ও শক্তিশালী পুরুষ বলতে যা বোঝায়, জঙ্গলী ঠিক তাই। দক্ষিণ রায় একা একা এঁটে উঠতে পারবে তো? ভয়ের সিঞ্চনে ভিজে যেতে লাগল ডাকুর প্রত্যাশা। সমস্ত সুলুক সন্ধান জানানোর পরে রায়বাঘ না পারলে তার সব আশা জলে ভেসে যাবে। একটা অচেনা ভয়ের রেশ খুব সঙ্গোপনে বুকের গভীরে ওঠানামা করতে শুরু করল। আবর ভাবতে পারল যে সেদিন দিনু সঙ্গে না থাকলে রায়বাঘ দিব্যি জঙ্গলীকে মেরে ফেলতে পারত। প্রস্তরবৎ একটা কঠিন বিশ্বাস ডাকুর মানসিক দোলাচলের মধ্যে স্থান করে নিতে থাকল। নিজের আশু প্রাপ্তির সঙ্গে মিল করে শেষপর্যন্ত রায়বাঘের জয়লাভ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারল না। দক্ষিণ রায় পারলে তবেই তো—।

আর দেরি করল না ডাকু। মা নারায়ণীর সঙ্গে তাকে দেখা করতেই হবে। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল। অস্তমিত সূর্য পশ্চিম আকাশে ডুবতে বসেছে। রায়প্রাসাদের সামনে গিয়ে ডাকল, মাইজি, ও মাইজি, আমি ডাকু, একটা ভালো খবর নিয়ে এসেছি।

মা নারায়ণী সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে যেন প্রস্তুত হয়েছিলেন। পায়ে পায়ে সামনে এসে বললেন—এভাবে ডাকার কী আছে, ভিতরে এস বাবা, বারান্দার উপরে উঠে বসো, কোনো সংকোচ করো না। মায়ের বাড়িতে এলে ছেলের মধ্যে কোনো দ্বিধা থাকতে নেই। দক্ষিণ রায় ঘরের ভিতর থেকে বলল, দেরি করো না মা, ডাকুদাকে খেতে দাও, এত বড়ো দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। বিনিময়ে যে প্লটটা দেওয়ার কথা বলেছ, সেটা ডাকুদাকে দেখিয়ে দাও।

এভাবে ডাকার কী আছে, ভিতরে এস বাবা, বারান্দার উপরে উঠে বসো, কোনো সংকোচ করো না। মায়ের বাড়িতে এলে ছেলের মধ্যে কোনো দ্বিধা থাকতে নেই। দক্ষিণ রায় ঘরের ভিতর থেকে বলল, দেরি করো না মা, ডাকুদাকে খেতে দাও, এত বড়ো দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। বিনিময়ে যে প্লটটা দেওয়ার কথা বলেছ, সেটা ডাকুদাকে দেখিয়ে দাও।

মা নারায়ণী আবার বলতে শুরু করলেন, জানো বাবা ডাকু, দক্ষিণের কথা শুনে খুব খুশি হতে পারলুম। ভাই ভাই মিলেমিশে থাকলে মা হিসেবে আনন্দেই থাকা যায়। যে কোনো মায়ের জীবনে সেটাই মস্ত বড়ো পাওনা।

ডাকু ডাকল, মাইজি!

বলো বাবা বলো।

ঘরের ভিতর থেকে আবার দক্ষিণ রায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ডাকুদা তাহলে ভালো খবর নিয়ে এসেছ তো?

এই তো সবে এল, ওকে বলতে দে।

তাহলে ডাকুদাকে কিছু খেতে দাও, আমার জন্যে খুব কষ্ট করছে।

ডাকুর পেট তখনও বেশ ভারী হয়েছিল। দুপুরে অনেকটাই মধু খেয়ে ফেলেছিল কিন্তু সেই প্রসঙ্গ নারায়ণীর কাছে প্রকাশ করতে পারল না। বরং ঘুরিয়ে বলল, মাইজি, অবেলায় এটা ওটা খেলে শরীর খারাপ করতে পারে, বরং বাড়িতে ফিরে গিয়ে একেবারে ভাত খাবো।

তাহলে তাই খেয়ো বাবা, কী খবর এনেছ, তাই বলো।

খুব জবর খবর মাইজি।

আমি তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

জঙ্গলের নিরিবিলি বড়ো বিলে জঙ্গলী কোন সময়ে সাঁতার কাটে তা জেনে ফেলেছি, দেখেও এসেছি।

অবাক দুচোখ মেলে নারায়ণী চেয়ে থাকলেন ডাকুর দিকে।—ঠিক বলছ তো বাবা?

মাইজি, আমি তোমার কাছে কিছু মিথ্যে করে বলতে পারি?

তোমাকে খুব বিশ্বাস করি বাবা। কোনো সন্দেহ করে এ প্রশ্ন করিনি। এত সহজে জেনে ফেলতে পারলে, তাতেই অবাক হয়েছি। ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছিনে। এসব নিয়ে বাঘ-ছেলের সঙ্গে নিরিবিলি আলোচনা সেরে নেব।

ঘরের ভিতরে থাকা দক্ষিণ রায় শারীরিক উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারলেন না।—তাহলে সুযোগ এমনি করেই আসে? বারান্দার উপরে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। দু'কান খাড়া করে রাখলেন মায়ের সঙ্গে ডাকুর কথোপকথন শোনার জন্যে।

—বলো বাবা ডাকু, বিলটা ঠিক কোন্ জায়গায়?

বনবিবি যেখানে থাকে তা কী জানা সম্ভব হয়েছে?

জানতে পেরেছি বাবা।

ওই জায়গা থেকে সোজা পূবে যেতে হবে মিনিট পাঁচেক, তারপর দক্ষিণমুখো হয়ে কয়েক মিনিট গেলেই চারদিকে বড়ো বড়ো সবুজ গাছে ঘেরা সাত আট বিঘের বিল। মাইজি, কী স্বচ্ছ জল। সাঁতার কাটার সময় জলের ভিতরে জঙ্গলীর শরীরটা দিব্যি দেখা যাচ্ছিল।

ওর সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে?

অনেকক্ষণ কথা বলেছি, জঙ্গলীকে মাম্মু বলে ডেকেছি।

সেকি? কীভাবে তা সম্ভব হল?

বনবিবিকে মাইজি বলে ডাকার ফলে জঙ্গলী সম্পর্কে মাম্মু হয়ে গেছে।

নারায়ণী মুখ টিপে না হেসে পারলেন না।

সত্যি কথা বলছি মাইজি!

সেজন্যে হাসিনে ডাকু।

তাহলে?

এভাবে সহজে সফল হতে পারবে তা ঘুণাক্ষরে ভাবতে পারিনি।

জানো মাইজি, বনবিবি খুব সরল মনের।

সেই সুযোগটুকু নিতে হবে বাবা।

দিনুর বাবা আমাকে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিল।

তারপর?

বনবিবি সেকথা শোনে নি। আমি ওখানে সব কথা বলেছি তোমাদের বিরুদ্ধে। শুনতে শুনতে বনবিবি বিহ্বল হয়ে পড়ছিল। শেষপর্যন্ত আমাকে ভালো মনে গ্রহণ করল, মাম্মুও তাই।

তোমাকে সাবাস দিলুম ডাকু, একটা বড়ো কাজ সারতে পারলে। এখন বড়ো ছেলে পেরে গেলে নতুন করে পুরনো অবস্থান ফিরে পাব,—হ্যাঁরে দক্ষিণ, পারবি তো?

তটস্থ পায়ে রায়বাঘ আরও সামনে সরে এসে বলল, ডাকুদাকে তো এখনও কিছু খেতে দিলে না?

ও বলছে, এখন কিছু খাবে না। ডাকুর কথাগুলো শুনেছিস তো?

শুনেছি মা।

পারবি সফল হতে?

একা পেলে কয়েক মিনিটেই।

কবে কীভাবে সম্ভব করে তুলবি, সেটাই শুধু জানতে বাকি থাকল ডাকু।

মাইজি—।

হ্যাঁ বলো ডাকু।

মাম্মু সাঁতার শুরু করে সকাল দশটায়, বারোটা পর্যন্ত তা চলে। জায়গাটা ভালো করে চিনে নেওয়ার জন্যে একদিন বিকেলে দুজনে মিলে গিয়ে দেখে নিলেই হল।

সাঁতার দেবার সময় দিনু কী ওখানে থাকে?

না না মাইজি, মাম্মু একাই যায়, একাই সাঁতার দেয়, একাই বাসাতে ফিরে আসে।

প্রতিদিনের রুটিন?

আমি তাই জেনেছি। বলতে বলতে ডাকুর শরীর একবার কেঁপে উঠল যা নারায়ণীর নজর এড়িয়ে গেল না। বললেন, এভাবে কেঁপে উঠলে যে?

মাম্মুর বুকের ছাতি পঞ্চাশ ইঞ্চির বেশি, তাই ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল।

আমার ছেলে দক্ষিণকে কমা ভেব না ডাকু। ও বাঘের মূর্তি নিলে ওইরকম দশগন্ডা মাম্মুকে মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারে।

আমি তাই চাচ্ছি।

তুমি দক্ষিণের বড়ো ভাই, অন্য কিছু চাইতেই পারো না। আজ কী বলবে, কবে দক্ষিণকে নিয়ে বিলটা দেখতে যাবে?

আরেকটা দিন নিজে গিয়ে জায়গাটা ভালো করে দেখে আসি, সেসব শুনে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলে ভালোই হবে।

তাহলে ওইকথা থাকল বাবা।

আসছি মাইজি।

দক্ষিণ রায় পাঁচশ টাকা ডাকুর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, চাল ডাল কিনে নিও। আজ থেকে তোমাদের খাওয়া পরার সব খরচ আমাদের কোষাগার থেকে ব্যয় হবে। সপ্তাহে সপ্তাহে এসে যা লাগে নিয়ে যেও।

ডাকু আবেগে গদগদ না হয়ে পারল না। বলল, তাহলে আসছি মাইজি।

যা দেখে এসেছ তা রূপ দিতে দেরি করো না বাবা।

মাইজি, কালকে আবার যাব বলে ভাবছি। বনবিবিকেও মাইজি বলে ডেকেছি, কাজে সফল না হওয়া পর্যন্ত রোজ যেতে হবে।

তোমার ভাবনা খুব ভালো।

মাইজি, এটুকু করতেই হবে।

এ সপ্তাহে দক্ষিণ গিয়ে তোমাকে যে জায়গাটা দেব বলেছি, তা দেখিয়ে দিয়ে আসবে।

সেদিন যে প্লটটার কথা বলেছিলে, সেটাই তো?

হ্যাঁ বাবা, সেটাই। শুধু চারদিকের সীমানা বের করে দিতে হবে।

বেজায় খুশিতে আপ্লুত হল ডাকু, কিন্তু বাইরের আচরণে তা প্রকাশ করল না। ধীর পায়ে বারান্দা থেকে উঠোনে নামল। মনের গতিতে সমুদ্রের সচলতা। দ্রুত পা ফেলে তালে তালে সামনে এগিয়ে চলল।

মিনিট কুড়ি পরে ডাকু এমনভাবে বাড়িতে ঢুকল যেন একটা বড়ো যুদ্ধ জয় করে ফিরেছে। স্ত্রী সূচীর অবাক প্রশ্ন, এভাবে শরীর টান টান করে কথা বলছ কেন?

না মানে—।

কী হয়েছে বলবে তো?

অনেক বড়ো লাভ করে ফিরতে পেরেছি গো। বোধ হয় এতদিনকার দুঃখকষ্ট শেষ করে দিতে পারব।

শুধু কল্পনা নয় তো?

দ্যাখো, দ্যাখো, দক্ষিণ রায় কত টাকা দিয়েছে আমাদের সংসার চালানোর জন্যে। প্রতি সপ্তাহে এভাবেই দিয়ে যাবে। তাও বলে দিল আমাকে।

এমনি এমনি দিতে চাচ্ছে কেন?

সে অনেক কথা, কাল সকালে সব বলব তোমাকে।

এখন বলতে অসুবিধা কোথায়?

কেমন যেন দুরন্ত আবেগে ভেসে যাচ্ছি গো।

এত আবেগ আসছে কোত্থেকে শুনি?

তাও জানতে চাচ্ছ?

জানতে হবে বই কী। সুন্দরবন জুড়ে এখন যা চলছে তাতেই ভীষণ ভয় পাচ্ছি।

আমরা তো নদীর এপারে থাকি, দক্ষিণ রায়ের আশ্রয়ে, তার পরেও ভয় পাচ্ছ?

জঙ্গলীর হাতে রায়বাঘের মার খাওয়া নিয়ে ভাববে না?

ডাকুর বুকের ভিতরে ধক করে সাড়া হল। দুচোখের সামনে পঞ্চাশ ইঞ্চির বুকের ছাতির দৃশ্য একবার ভেসে উঠে নিভে গেল। কী সাংঘাতিক শরীরের গঠন। তার মতো গন্ডাপাঁচেক মানুষকে মুহূর্তে আছড়ে মেরে ফেলতে পারে।

সূচীর তীব্র প্রশ্ন, এভাবে চুপ করে থাকলে যে?
অন্য কিছু ভাবছি।
জঙ্গলীকে কখনো দেখেছ?
ডাকু প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইল।
দেখেছ কিনা বলো?
একথা শুনে লাভ কী?
তাহলে আমাকে লাভ করে বাড়ি ফেরার কথা বললে কেন?
ডাকু চুপ করে থাকল।
কিছু এড়িয়ে যেতে চাচ্ছো নাতো?
ডাকু রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে অন্ধকার উঠোনের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালো।

সূচী ডাকুর এ আচরণ আগে কখনো দেখেনি। বেশ অবাক হল। কোন্ লোকটাকে দেখছে সে? তার ডাকু তো? রাগ করার মতো কিছুই বলা হয়নি, অথচ... তাহলে কী এমন কিছু ঘটেছে যা তাকে বিশ্বাস করে বলতে পারছে না? সূচী ভিতরে ভিতরে নরম হতে বাধ্য হল। পায়ে পায়ে চিলতে তুল্য বারান্দা টপকে অন্ধকার উঠোনে নেমে ডাকল, কই গো তুমি?

সূচী ডাকুর এ আচরণ আগে কখনো দেখেনি। বেশ অবাক হল। কোন্ লোকটাকে দেখছে সে? তার ডাকু তো? রাগ করার মতো কিছুই বলা হয়নি, অথচ... তাহলে কী এমন কিছু ঘটেছে যা তাকে বিশ্বাস করে বলতে পারছে না? সূচী ভিতরে ভিতরে নরম হতে বাধ্য হল। পায়ে পায়ে চিলতে তুল্য বারান্দা টপকে অন্ধকার উঠোনে নেমে ডাকল, কই গো তুমি?

আবার জ্বালাতন করতে এলে?
আগে বলো, এভাবে রাগ করলে কেন?
গোপন কথা চেপে রাখার ক্ষমতা তোমার নেই।
এত গোপনীয়তার কী আছে?
তুমি ফলকা বলেই ভয় পাচ্ছি।

সূচী আবেগের আতিশয্যে ভাসতে ভাসতে সরে গিয়ে ডাকুর পাশে দাঁড়ালো। উঠোন জুড়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার, বাড়িতে কেউ নেই। ডাকুর শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর সিঁটিয়ে

দিল। ডান হাতের নরম তালু ডাকুর পিঠে রেখে বলল, এতদিনের সংসার, এভাবে আমাকে অবিশ্বাস করতে পারলে?

অবিশ্বাসের কথা নয় গো।

তাহলে কী?

ভীষণ গোপনে রাখার কথা।

আমি তা পারব না?

সেই ভয়ে দুলছি।

শুধু তোমার কথা ভেবে পারতেই হবে।

তাহলে একান্তই শুনতে চাচ্ছ?

সূচী আবেগে জড়িয়ে ধরল ডাকুকে।—এভাবে অবিশ্বাস করো না গো।

ডাকু নরম হতে বাধ্য হল। চাপা স্বরে ফিস ফিস করে কীভাবে বিবাদীয় দুপক্ষকে সে ম্যানেজ করে চলেছে তা বলতে বলতে নিজেই শিউরে উঠল। সূচী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ডান হাতের তালু ডাকুর পিঠ থেকে নেমে এল। এতক্ষণ সে দুটো শরীর পরস্পর সিঁটিয়ে ছিল, তা আলগা হতে শুরু করল। সূচী অস্ফুটে বলল, বড়ো কোনো বিপদে পড়ে যাবে নাতো?

এজন্যে এসব কথা তোমাকে বলতে চাইনি।

সূচী ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

ডাকুর সান্ত্বনা, আমার উপর বিশ্বাস রাখো সূচী। এত দিন দুঃখে থাকতে থাকতে আর পারছিলুম না। তাই বাধ্য হয়ে...। চরম উন্নতির পথে নানা ধরণের ঝুঁকি থাকতেই পারে।

একটা বড়ো দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল সূচীর বুকের গভীর থেকে। ডাকুর হাতে হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

শোনো সূচী, এ নিয়ে কারুর সঙ্গে কোনো আলোচনায় যাবে না।

অন্তত এটুকু বেশ বুঝতে পেরেছি।

এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ, ক'টা দিন কেন এত বেশি অস্থির হয়ে দিন কাটাতে হয়েছে।

সূচী চেয়ে থাকল স্বামীর মুখের দিকে। মনে করতে পারল যে স্বামীর দুচোখের তারায় যেন মা নারায়ণীর দেওয়া একশ

ডাকু নরম হতে বাধ্য হল। চাপা স্বরে ফিস ফিস করে কীভাবে বিবাদীয় দুপক্ষকে সে ম্যানেজ করে চলেছে তা বলতে বলতে নিজেই শিউরে উঠল। সূচী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ডান হাতের তালু ডাকুর পিঠ থেকে নেমে এল। এতক্ষণ সে দুটো শরীর পরস্পর সিঁটিয়ে ছিল, তা আলগা হতে শুরু করল। সূচী অস্ফুটে বলল, বড়ো কোনো বিপদে পড়ে যাবে নাতো?

বিঘের প্লট ভেসে রয়েছে। এও ভাবতে পারল যে সপ্তাহে সপ্তাহে যে টাকা পাবে তা দিয়ে তাদের সংসার দিব্যি চলে যাবে। রোজকার জীবনে দুঃখের কষাঘাত বলে কিছুই থাকবে না। একেবারে নতুন দিনের সূচনা হতে চলেছে। চাপা স্বরে বলল, আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি গো, যেমন এগিয়ে চলেছ, সেভাবেই চলতে থাকো। আর তো মাত্র ক'টা দিন। রায় বাঘ জিতে গেলে সব সমস্যা শেষ হয়ে যাবে। তুমি যে ফাঁদ পেতেছ, তাতেই জঙ্গলী ফালা ফালা হয়ে যাবে।

ডাকুও বার বার উদ্বেলিত হতে থাকল অনাগত দিনের অভিনব স্বপ্নে। ডান হাতের তালু মিশিয়ে দিল সূচীর বাম হাতের তালুতে। যে নতুন স্বপ্নের দৌড় শুরু হতে চলেছে, তাতেই সূচী-ডাকুর দাম্পত্য জীবন বার বার ঝলসে উঠতে লাগল।

পরের দিন সন্ধেয় আবার ডাকুর ডাক পড়ল নারায়ণীর বাড়িতে। মা নারায়ণী বিকেল থেকে সাত পাঁচ ভাবনায় বেশ অস্থির হয়েছিলেন। ডাকু বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকল, মাইজি, আমি এসেছি।

এভাবে ডাকতে নেই বাবা, তুমি আমার আর এক ছেলে, সোজা ভিতরে চলে আসবে, বারান্দার উপরে উঠে বসবে।

তাহলে পরের দিন থেকে।

আজ সকালে কী আবার ওদিকে গিয়েছিলে?

গিয়েছিলুম মাইজি। আরেকবার মাম্মুর সাঁতার দেওয়ার বিলটা ভালো করে দেখে নিয়েছি। জানো মাইজি, বেশ নিরিবিলি জায়গা। এই সুযোগে জঙ্গলীকে শেষ করে দেওয়া সহজে সম্ভব হবে।

ও নিয়ে খুব বেশি ভাবছিনে বাবা। আমার ছেলে একবার বাঘরূপ নিলে ওইরকম কয়েক গন্ডা জঙ্গলীকে মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারে। ওর কাঁধে ভর দিয়েই তো এতদিন জঙ্গলরাজ চালিয়ে এসেছি। সেজন্যে দক্ষিণ সুন্দরবন শাসনের দায়িত্ব নিতে পেরেছে। অবশ্য এ নিয়ে ছোটো ছেলে কালুর মধ্যে আজও বেশ অসন্তোষ রয়েছে। ও বুঝতে চায় না, বড়ো ছেলে যেভাবে শরীর নিয়ে জঙ্গীপনা দেখাতে পারে, তার ছিটেফোটাও ওর ভিতরে নেই। জানো ডাকু,

আমার ছেলে একবার বাঘরূপ নিলে ওইরকম কয়েক গন্ডা জঙ্গলীকে মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারে। ওর কাঁধে ভর দিয়েই তো এতদিন জঙ্গলরাজ চালিয়ে এসেছি। সেজন্যে দক্ষিণ সুন্দরবন শাসনের দায়িত্ব নিতে পেরেছে। অবশ্য এ নিয়ে ছোটো ছেলে কালুর মধ্যে আজও বেশ অসন্তোষ রয়েছে। ও বুঝতে চায় না, বড়ো ছেলে যেভাবে শরীর নিয়ে জঙ্গীপনা দেখাতে পারে, তার ছিটেফোটাও ওর ভিতরে নেই।

জঙ্গলে বসে রাজত্ব চালাতে গেলে বাহুবলের খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এর বাইরে তো কিছুই নেই।

ডাকু তালে তালে মাথা দোলাতে থাকল।

তারপর বলো, তোমার বনবিবি মাইজি কী বলল?

আমাকে দেখে খুব খুশি হল।

এত খুশি কেন?

ওখানে সব কথা বলেছি তোমাদের বিরুদ্ধে, শেষ করেছি সেভাবেই। যত জঙ্গলীর শরীরের প্রশংসা করেছি, বনবিবি তত বেশি সন্তুষ্ট হয়েছে। আরও বেশি করে শুনতে চেয়েছে। জানো মাইজি, গতকাল মাম্মুর শরীরের কসরত দেখে খুব অবাক হয়েছি।

কী রকম?

দিনুর বাপ-শ্যালা তখনও ওখানে ছিল।

কী কসরত দেখালো সেটাই বলো।

গেলেই মাম্মু বলল, এত সকালে ব্যাগে করে কী এনেছ দেখাও।

তুমি দেখালে?

মাইজিকে সন্তুষ্ট করার জন্যে অনেকটা মধু নিয়ে গিয়েছিলুম। তা দেখে বনবিবির চেয়ে জঙ্গলী বেশি খুশি হল। পাত্রটা হাতে তুলে নিয়ে জঙ্গলী কী করল জানো মাইজি?

নারায়ণী চেয়ে থাকল ডাকুর দিকে।

ঠিক এভাবে পাত্রটা ধরেছিল মাম্মু। তারপর ঢক্‌ঢক্‌ করে এক সের মধু সাবাড় করে দিল।

সত্যি?

নিজের চোখে দেখেছি মাইজি।

তারপর কী হল বলো?

একটু পরে দিনুর ঢ্যামনা বাপ এসে আমার দিকে কটমট করে তাকাতে থাকল। মাম্মু সরে এসে আমার দুহাত চেপে ধরে বলল, চলো, তোমাকে আজ দিনুর গদা রাখার ঘরটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

অনেক গদা সংগ্রহ করে রেখেছে নাকি?

গোটা পঞ্চাশ তো হবে।

এতগুলো কেন? গিয়ে কটা গদা দেখতে পেলে?

গুণে দেখি পয়তাল্লিশটা।

এতগুলো? করে কী এসব নিয়ে?

একটু পরে তা নিজের চোখে দেখেছি মাইজি।

নারায়ণী উৎসাহ নিয়ে বললেন, তারপর?

জঙ্গলী সবচেয়ে মোটা গদাটা হাতে নিয়ে বাইরে এসে ঘোরাতে শুরু করল। এত জোরে ঘেরাতে থাকল যে ওকে আর দেখা যাচ্ছিল না। সোঁ সোঁ শব্দদোল বার বার আমার শরীরে ছ্যাকা দিচ্ছিল।

এত জোরে?

না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না মাইজি। দিনু পাশে দাঁড়িয়ে একটাই মন্ত্র জপ করে চলল।

সেটা আবার কী?

বার বার বলছিল, জয়, একলব্যের জয়।

নারায়ণী দাঁতে দাঁত রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে শুরু করলেন, আমার জঙ্গলে থেকে, আমার ফলমূল খেয়ে হারামির বাচ্চা কেবল একলব্যের জয় দেখতে পেল? ওকে শেষ না করে ছাড়ব নারে ডাকু।

রায়বাঘ সামনে এসে বলল, সেদিনও এই দিনু হারামি জয় একলব্যের জয় বলে আমাকে ভীষণ জোরে আঘাত করেছিল। আর সহ্য করতে পারছি নে মা। তুমি ডাকুদার সঙ্গে আলোচনা করে দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলো। প্রথমে জঙ্গলীকে শেষ করব। দিনুকে এক গালে না নিতে পারি তো আমার নাম...।

ডাকু, এ্যাই ডাকু, বলতে বলতে আবেগে গলা বুজে এল নারায়ণীর। আঁচল দিয়ে একবার দুচোখ মুছে নিলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, সেদিন দিনুর কাণ্ড শুনে খুব দুঃখ পেয়েছিলুম রে ডাকু।

সেই স্বাধীনতা আজ থেকে তোকে দিয়ে দিলুম রে।

মা, ডাকুদার সঙ্গে শলাপরামর্শ করে শুধু একটা পথ বাতলে দাও, দুই ঢ্যামনা যেন একসঙ্গে না থাকে।

হ্যাঁরে ডাকু, জঙ্গলী কী রোজ গদা হাতে নিয়ে বিলে সাঁতার দিতে যায়?

সেরকম দেখিনি মাইজি। আজ তো আবার বিলের চারপাশ ভালো করে দেখে নিয়েছি। নির্দিষ্ট দিনে কোন পথে গিয়ে আক্রমণ করলে সুবিধে হবে, সেই ছকও কষে ফেলেছি।

ডাকু, এ্যাই ডাকু, বলতে বলতে আবেগে গলা বুজে এল নারায়ণীর। আঁচল দিয়ে একবার দুচোখ মুছে নিলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, সেদিন দিনুর কাণ্ড শুনে খুব দুঃখ পেয়েছিলুম রে ডাকু। তুই জানিস নে, আমিই উদ্যোগ নিয়ে ওদেরকে সুন্দরবনে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছি। ছোটোনাগপুর থেকে আসা কালো মানুষদের দ্বিতীয় দল জটার দেউলের আশেপাশে বসবাস করতে শুরু করেছিল। অবশ্য ওদের বড়ো অংশ জটার দেউলের উত্তরপূব দিকে নিজেদের আবাস অবস্থান গড়ে তুলেছিল। এ নিয়ে আমি কোনো দ্বিমত করিনি। যে যেখানে পারে, সুখে থাকুক। ঘরের ছেলে সেই দিনু আমার দক্ষিণকে এভাবে আঘাত করতে পারল? ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন নারায়ণী।

বুজে আসা গলায় ডাকু ডাকল, মাইজি, বলছি কী...।

....ক্রমশ

নীহারুল ইসলাম

আনন্দ ভৈরব

হাসান আজিজুল হক নামের একজন লেখকের 'শকুন' নামে একটি গল্প পড়ে আমি রীতিমতো বিভ্রান্ত। খোঁজ নিয়ে জানলাম লেখক বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী। থাকেন রাজশাহীতে। তিনি শুধু সেখানে থাকেন না, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। দর্শনের অধ্যাপক তো বটেই, সেই সঙ্গে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধানও তিনি।

কিন্তু রাজশাহী তো ওপার বাংলার বরেন্দ্রভূমি! সেখানে বসে একজন লেখক এপারের রাঢ়ভূমির গল্প লেখেন কী করে? চটজলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, আমি রাজশাহী যাব। লেখকের সঙ্গে দেখা করব।

বন্ধু আসমহম্মদকে বলি ব্যাপারটা। আসমহম্মদের বাড়ি সীমান্তগ্রাম লতিবের পাড়ায়। তাদের বাড়ির পাশেই বর্ডার। ওপারে তার অনেক আত্মীয়স্বজন রয়েছে। সেইসূত্রে ওপারের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। স্বভাবতই সে আমার রাজশাহী যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। পরের দিন আমি সকাল সকাল রাজশাহীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি।

আমাদের লালগোলা, তার পাশেই বিশাল পদ্মার চর। চরে একটিই মাত্র বাংলাদেশী গ্রাম। নাম কোদালকাটি। সেই কোদালকাটি গ্রাম পেরোলেই পদ্মা। আর পদ্মার অপর পাড়েই গোদাগাড়ির অবস্থান।

গোদাগাড়ি একটা ছোট গঞ্জ। ঘন জনবসতির মাঝে কিছু দোকানপাট, স্কুল, থানা, বিডিআর ক্যাম্প। সেসব পেরিয়ে আমি গিয়ে পৌছই বাসস্ট্যাণ্ডে। নবাবগঞ্জ-রাজশাহী পাকা সড়কের ভায়া স্টপেজ হল এই গোদাগাড়ি। অতএব ছোট গঞ্জ হলেও জায়গাটির বেশ গুরুত্ব আছে। নদীঘাট থেকে বাসস্ট্যাণ্ডে যেতে যেতে সেটা আমি টের পাই।

বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে বাস আসে, আমি উঠে পড়ি তাতে। পরের স্টপেজ রেলবাজার। সেখানে কোনও এক পিরবাবা মানুষের সেবায় মাজারে শুয়ে রয়েছেন দীর্ঘদিন। যাতে তিনি আরও আরও অনেকদিন মাজারে শুয়ে মানুষের সেবা করে যেতে পারেন তার জন্য সেই মাজার-কমিটির লোকেরা বাস ঘিরে ধরে ধরে চাঁদা আদায় করছে। যে যা পারছে, দিচ্ছে। সামর্থ্য মতো আমিও দিলাম। যাতে পিরবাবার রহমতে ভিনদেশে আমার কোনও রকম বিপদ না ঘটে।

অথচ রাজশাহী পৌঁছে আমার চক্ষু চড়কগাছ! চারপাশে পুলিশ আর পুলিশ। আমি যাব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার কাছে পাসপোর্ট নেই। তাই ভয়ে ভয়ে একটা রিক্সা নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে পৌঁছনোর আগেই আমার দম বন্ধ অবস্থা হয়। সেখানে এত পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাই যে ভয়ে দূর থেকে রিক্সা ফিরিয়ে আমাকে চলে আসতে হয় নিরাপদ দূরত্বে।

বন্ধু আসমহম্মদ বলেছিল, তেমন কোনও অসুবিধায় পড়লে একজনের ঠিকানা দিচ্ছি। সোজা তার কাছে চলে যাবি। আমার কথা বলবি। আমার বন্ধু লোক। খুব ভাল মানুষ। তোর সব অসুবিধা দূর করে দেবে।

আনন্দ ভৈরব : ১

আমি রিক্সাবালাকে সেই লোকের কথা বললাম। রিক্সাবালা নিমেষেই আমাকে তার কাছে পৌঁছে দিল। পৌঁছে দিল মানে, প্রথমে একটা কানাগলি-সেটা পেরিয়ে রিক্সাবালা আমাকে যেখানে নিয়ে এল সেটা বস্তি মতো একটা কিছু। অন্তত আমার তাই মনে হল। আমি অনেক বস্তি দেখেছি। দেশভাগ জনিত কারণে আমার বাড়ির চারপাশে ৪৭/৭১-এ ওপার বাংলা ছেড়ে আসা অসংখ্য মানুষের বাস। যাঁরা আজকের দিনেও খলপার টাটির ওপরে করগেট টিনের ছাউনি দেওয়া ঘরে বাস করে।

সেরকম বস্তির মাঝে এটা একটা রাজবাড়ি যেন। যদিও জরাজীর্ণ। সিংহ দরজা আছে ঠিকই, কিন্তু পাল্লা নেই। তাই বোধহয় রিক্সাবালা একেবারে বাড়ির মধ্যে রিক্সা প্রবেশ করিয়ে একটা ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। শুধু তাই না, কাকে যেন হাঁক ছেড়ে বলে-অ ওস্তাদভাই দ্যাখো-তোমার ঘরে কারে আনছি!

এরই মাঝে আমি ভাড়া দিতে গেলে রিক্সাবালা বলে ওঠে- ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! কী কন কত্তা? আপনি হইলেন হারঘের ওস্তাদভায়ের কুটুম! আপনার থেক্যা ভাড়া লিমু ক্যামনে? বলেই সে আর দাঁড়ায় না, চলে যায়।

ঘরের ভেতরটা স্যাঁৎসেঁতে। কেমন বিদঘুটে গন্ধ! তাবাদেও সব কেমন এলোমেলো। অগোছালো। সেসবের মধ্যে একটা ছাপরখাটে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা একজন মানুষ রিক্সাবালার ডাকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আমাকে যেভাবে আপ্যায়ণ করে, আমি হতবাক হয়ে যাই! আমার সম্পর্কে কিছু না জেনেই নিজের শুয়ে থাকা ছাপরখাটের তেলচিটে বিছানা ঝেড়ে আমাকে বসার জায়গা করে দেয়। তারপর আমার সম্পর্কে সব

জেনে মানুষটি যা বলে, তা অনেকটা এরকম-বছেন ভাই। একটুখানি জিরান ল্যান। ছরবত খান। আপনার চিন্তার কুনু কারণ নাই। হামি আপনার ছঙ্গে আসি। আছমহম্মদভায়ের দোছত আপনি, মানে হামারো দোছত। মুনে করেন, এই বাড়ি আপনার লিজের বাড়ি।

যত সহজে এবং যে আন্তরিকতায় মানুষটি আমাকে তার দোস্ত বানিয়ে নেয়, আমার মাথায় কিছুই ঢোকে না। তবে সত্যিকারের মানুষটির 'ওস্তাদ' নাম সার্থক মনে হয়।

আমি দাঁড়িয়েই আছি। ইতিমধ্যে একজন মহিলা বড় একটা ফুলতোলা কাঁচের গেলাসে সরবত নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার উদ্দেশে বলছে-ল্যান ভাই ধরেন। ছরবত খান।

মহিলা নিশ্চয় ওস্তাদের বউ। সরবতের গেলাস হাতে নিতে নিতে অনুমান করি। কিন্তু বুঝতে পারি না, মহিলা একজন অপরিচিত পুরুষের সামনে এত স্বাভাবিক হয় কী করে? আমার হাতে সরবতের গেলাস ধরিয়ে দিয়ে ড্যাবড্যাব করে আমাকে দেখছে। তার মধ্যে মহিলাকে ঘিরে ধরেছে একগোণ্ডা বালবাচ্চা। তারা কিলবিল করছে। বলছে-মা, ছরবত খাবো! মা, ছরবত খাবো! দে না গে মা, ছরবত!

এই দৃশ্য দেখে আমার হাতের সরবতের গেলাস হাতেই থেকে যায়। মুখে তুলতে পারি না। বাচ্চাদের দিকে খেয়াল নেই মহিলার। মেহেমানকে নিয়েই ব্যস্ত সে। নাকি এর মধ্যে অন্য কোনও গল্প আছে? হয়ত আমার দেশেই এই মহিলার বাপের বাড়ি। হয়ত বর্ডার পেরিয়ে বহুদিন সে তার বাপের বাড়ি যেতে পারেনি। হয়ত তার সেই দুঃখ আমাকে শোনাতে চাইছে। কিংবা শুনতে চাইছে তার মা-বাবা কেমন আছে?

আনন্দ ভৈরব : ২

কিন্তু মেহেমান সরবতের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে যে! বিছানায় স্বামী বসতে জায়গা করে দিলেও বসেনি। হয়ত নোংরা বিছানা বলেই! হঠাৎ সেটা খেয়াল হতেই শরমে আপন মনে 'ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!' বলতে বলতে মহিলা ছুটে যায় ঘরের বাইরে। মেহেমানকে বসতে দেবার জন্য কিছু একটা আনতে বোধহয়।

ওস্তাদ মানুষটা এতক্ষণ ঘরে ছিল না, কথা বলতে বলতে কখন বাইরে বেরিয়ে গেছিল, আবার ফিরে আসতেই আমি তাকে খেয়াল করি। ঘরের কোণায় থাকা আলমারি থেকে কী বের করতে করতে বলছে-জলদি করেন ভাই। ভারছিটির ক্লাস শুরুর আগেই আপনার হাছানছাহেবেরে ধরতি হবে। নাকি খুব দরের মানুষ! ছময়ের দর বোঝেন। হামি খোঁজ লি আইলাম। আপনি জলদি জলদি ছরবতটা খাইয়া ল্যান।

এবারে আমি আর সরবত হাতে ধরে রাখতে পারি না, এক চুমুকেই খতম করে ফেলি। আমার যে এত তেষ্টা লেগেছিল তা বুঝতে পারিনি।

আসলে ধূ ধূ বালির চরের ওপর দিয়ে প্রায় ঘণ্টা খানেক হেঁটে আসা, ভুটভুটি নৌকায় পদ্মা পেরনো। তারপর গোদাগাড়ি থেকে বাসে রাজশাহী বাসস্ট্যাণ্ড। সেখান থেকে রিক্সা চড়ে ঘুরতে ঘুরতে এখানে। শুধুমাত্র হাসান আজিজুল হক নামের এক গল্পকারের সঙ্গে দেখা করার জন্য। যিনি বরেন্দ্রভূমির মানুষ হয়ে রাঢ়ভূমির পটভূমিতে 'শকুন' নামের গল্প

লেখেন কী করে? বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া এমন গল্প লেখা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাছাড়াও ওই গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে আমি নিজেও একজন। আমি পড়াশোনার পাশাপাশি রাখালিও করেছি। রাখালবালকদের সঙ্গে ঠিক ওই গল্পের মতোই শকুন মেরেছি। শুধু তাই না, গল্পের চরিত্র যে ভাষায় কথা বলছে, আমি নিজেও সেই ভাষায় কথা বলেছি আমার শৈশব-কৈশোরে। অথচ ভাষার চরিত্র হচ্ছে প্রতি দশ কিমি অন্তর বদলে যাওয়া। তাহলে এটা সম্ভব হয় কী করে? এইসব প্রশ্ন নিয়ে বিনা পাসপোর্টে বন্ধু আসমহম্মদের সহায়তায় আমি ছুটে এসেছি এই বিদেশ বিভুঁইয়ে। যে দেশটায় আবার গণতন্ত্র নেই। সামরিক শাসকের অধীন। যেখানে সেখানে পুলিশ। মিলিটারি। অগত্যা এই ওস্তাদ মানুষটির দ্বারস্থ হওয়া। এসবের মধ্যে হয়ত জলতেষ্টার ব্যাপারটা চাপা পড়ে গিয়েছিল।

বাড়ি থেকে বেরোতেই আমার চোখ পড়ে সিংহ দরজার বাঁ-দিকের একটি পরিত্যক্ত জায়গার ওপর। ইটের প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীর কোথাও এক ফুট দাঁড়িয়ে আছে তো কোথাও মটির সঙ্গে মিশে গেছে। মধ্যেখানে একটা শিবলিঙ্গ। পাশেই একটা বেলগাছ দাঁড়িয়ে। জায়গাটাকে ছায়া করে রেখেছে।

কানাগলি পেরিয়ে আমরা আবার বড় রাস্তায় উঠেছি। ওস্তাদ একটা খালি রিক্সা দেখে হাঁক ছেড়ে ডাক দেয়। রিক্সাবালা তাঁর ডাক শুনে এসে দাঁড়ায় আমাদের পাশে। আমরা চড়ে বসি তাতে। রিক্সা চলতে শুরু করে। সেই সঙ্গে রিক্সাবালার বকবকানি শুরু হয়-কনে যাইবেন ওস্তাদভাই? ছঙ্গে মেহেমান দেখত্যাসি। ইন্ডিয়া থেইক্যা আইত্যাসে বোধায়। কে লাগে? ভাবীজানের ভাই নাকি?

বকবক না কইর‍্যা রিক্সা টান। ভারছিটি যাওন লাগবো। তার আগে নিজাম হোটেলে লিয়া চল।

ধমকের স্বরে বলে ওস্তাদ। কিন্তু রিক্সাবালার মুখে আমি এ কী শুনছি? একথা তো আমি একটু আগে সরবতের গেলাস হাতে নিয়ে ভাবছিলাম। আশ্চর্য!

আনন্দ ভৈরব : ৩

এর মধ্যে রিক্সাটা আমাদের নিয়ে এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ায় যে আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে। জায়গাটা দেখে আমি অবাক না হয়ে পারি না। রাস্তার ধারে নয়নজুলির ওপর গোটা গোটা বাঁশের পাটাতন। তার ওপর সার সার খলপার টাটির ওপর করোগেটের টিন দেওয়া ঝুপড়ি ঘর। ঘরগুলি আবার এক একটা হোটেল। কোনটার নাম 'আমিনা', কোনটার নাম 'কোহিনুর', কোনটার নাম 'নিজাম'।

ওস্তাদ বলে-নামেন ভাই, চলেন এট্টু নাছতা কইর‍্যা লিই।

বাড়িতে শুধু সরবত খাইয়ে রিক্সা চড়িয়ে হোটেলে নাস্তা খাওয়াবে, ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে আমি কোনও কুলকিনারা পাই না। বেবাক দাঁড়িয়ে থাকি।

তা দেখে ওস্তাদ আবার আমায় তাগাদা মারে। না, এর পর আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। অগত্যা আমাকেও একটি হোটেলে ঢুকতে হয় ওস্তাদের পিছু পিছু।

ভিতরে দেখি বাঁশের পাটাতনের ওপর গজাল গেঁথে বেঞ্চ-হাই বেঞ্চ আটকানো। তাতে বসে অনেকেই খাচ্ছে। হোটেল-কর্মী, খরিদ্দারের হাঁটাচলায় পাটাতন দোল খাচ্ছে, কিন্তু কারও কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। খরিদ্দাররা খেতে ব্যস্ত। হোটেল-কর্মীরা খাওয়াতে ব্যস্ত। মালিক ক্যাশ মেলাতে ব্যস্ত। অথচ পেটে খিদে থাকা সত্ত্বেও আমার রীতিমতো ভয় করছে। বাঁশের পাটাতনের নীচেই বিশাল খাল। খালে জল কাদা সমান সমান। তার মধ্যে অসংখ্য কাক আর কুকুরের দাপাদাপি। কোনও কারণে পাটাতন ভেঙে পড়লে আর দেখতে হবে না, কাক-কুকুরে আমাদেরও ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

ইতিমধ্যে আমাদের সামনে নাস্তা পরিবেশিত হয়েছে। আমি খেয়াল করিনি। ওস্তাদ যখন বলল, খাইয়্যা ল্যান ভাই। ঠাণ্ডা মারলে আর খাইতে পারবেন না, চর্বি জমে যাবে। তখন আমি দেখি আমার সামনে বড় একটা চিনামাটির প্লেটে তন্দুরি রুটি আর একটা বড় বাটিতে পায়চা।

পায়চা দেখে আমার চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। গরুর গোটা ঠ্যাঙ সাজিয়ে দিয়েছে যেন! কিভাবে খাব? এতবড় হাড় মুখে লাগিয়ে মজ্জা টানা যায় নাকি?

না, টানা যায় না। তবে খাওয়া যায়। আমি ওস্তাদকে দেখি, ওস্তাদ তার বাঁ-হাতটা পায়চার বাটির ওপর রেখে ডানহাতে পায়চার বড় হাড়টা শক্ত করে ধরে বাড়ি মারছে। ওতেই মোটা হাড়ের ভিতর থেকে মজ্জা খসে খসে পড়ছে বাটিতে।

গল্পকারের খোঁজে এসে আমি যেন গল্পের খোঁজ পাচ্ছি। আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। হয়ত সেই আনন্দেই আমি ওস্তাদকে জিজ্ঞেস করে বসি- ভাই, বাড়ি ছেড়ে আপনি আমাকে এতদূরে হোটেলে নাস্তা করাতে নিয়ে এলেন কেন?

ওস্তাদ খাওয়া বন্ধ রেখে বলে, দ্যাখেন নি ভাই হামার বাড়ির দূয়ারে একটা ছিবমন্দির আসে! আছলে ওই বাড়িটা সিলো এক হিন্দু লোকের। হামার বাপের কাছে সেই লোক ওই বাড়ি বিক্রি কর‍্যা ইন্ডিয়ায় চলে যায়। হামার বাপেরে কহে যায়, আর কিছু না পারি, ছম্ভব হলে মন্দিরটার য্যানে মান রাখি। তাই হামরা বাড়িতে গোমাংছ ঢুকায় না ভাই।

আনন্দ ভৈরব: ৪

একথা শুনে শুধু আমি একা আনন্দিত হই না, আমি দেখি পাটাতনের নীচের জল-কাদায় অগুনতি কুকুর আনন্দে লটাপটি খাচ্ছে। গলাগলি যাচ্ছে। কাকগুলি হোটেলের নীচের বদ্ধ হাওয়ায় মুক্ত মনে উড়ে বেড়াচ্ছে। ভেসে বেড়াচ্ছে। কেউ কারও সঙ্গে লড়ালড়ি করছে না। কাড়াকাড়ি করছে না। সেই সঙ্গে আমি এটাও দেখতে পাই, ওস্তাদের বাড়ির সিংহ দরজার পাশে পরিত্যক্ত শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গের মাথায় বসন্ত বাতাসে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেলগাছ থেকে একটা দু'টো বেলপাতা খসে খসে পড়ছে। জীব-প্রকৃতির সব আনন্দ উল্লাস ভেসে আসছে আমার কানে। আমার সব ভয় কেটে যাচ্ছে।

পবিত্র সাঁফুই

ভয়়

১

রাতের দিকটা কাটতে চায় না। পাশের বাড়ির কুকুরটা মাঝে-মাঝে কুঁই কুঁই করে, আরো সতর্ক হয়ে উঠি। ঘুম নেই বললেই চলে। ঘরের মধ্যে আলো জ্বালানো প্রায় বন্ধ করে দিয়েছি। মাঝে মাঝে বিড়ি ধরাতে গিয়ে ফস করে ওঠা দেশলাই কাঠির শিখায় চারদিক দেখে নিই, দরজার দিকে টেবিলটা ঠেলাই আছে নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে। খড় খড় করে ইঁদুরে বই কাটে। ওগুলো আর দরকার নেই। বইকাটার শব্দ আর আমি নির্জনে জেগে থাকি, পরস্পরের সান্নিধ্যে খানিকটা স্বস্তি বোধ করি এই চুপ হয়ে যাওয়ার দিনকালে। আমাদের বিপন্নতাকে মাড়িয়ে হাইওয়ে দিয়ে ভারী ভারী গাড়ি চলে যায়। আজকাল গাড়ি চলাচল বেড়ে যাচ্ছে খুব, ওতে করে কি মানুষ পাচার হয়?

ভয়টা পাঁজর চেপে ধরছে। কারা যেন খুঁজছে আমাকে। দিনের বেলায় নিজেকে যতটা সম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করি। একরাস্তায় দুবার পারতপক্ষে যাতায়াত করি না। যাই এক দিক দিয়ে, ফিরি অন্য পথে। পাড়ার গলি খুঁজি, আড়াল-আবডাল, সদর অন্দর বাহির সব আমার নখদর্পণে। তাছাড়া শেষ কিছুদিন ধরে বিভিন্নরকম ফন্দিফিকির আয়ত্ত করেছি। পিছনের দিকে না ফিরেই কান খাড়া করে বলে দিতে পারি কেউ অনুসরণ করছে কিনা, বুকপকেট থেকে পেন পড়ে যাওয়ার অছিলায় ঝুঁকে পড়ি শুধুমাত্র অবস্থান পরিবর্তনের জন্য। দাড়ি রাখছি, চুলও কাটছি না অনেক দিন, যাতে মুণ্ডুটাকে ঢেকে ফেলা যায়। মুখ-চোখ ঢেকে নিজেকে অচেনা করার প্রাণান্তকর চেষ্টা। পোশাক পরিবর্তন করি নিয়মিত। হাফপ্যান্ট পরে বেরোই, ব্যাগে লুঙ্গি রাখি। ফেরার পথে পরে নিই। জানি, সময় ঘনিয়ে আসছে, এত কিছু করেও রেহাই পাব না।

২

এরকম দিনের পর দিন না ঘুমোলে তো তোমার শরীর ভেঙে পড়বে। তুমি ক্লান্ত বোধ করো না?

মোটেই না। বেঁচে থাকার জন্য ঘুমের থেকে সচেতন থাকাটা বেশি জরুরী। যে কোনো মুহূর্তে তুমি খুন হতে পারো। আততায়ীর সামনে দাঁড়িয়ে জীবনকে উপলব্ধি করার সুযোগ আমি ছাড়তে চাই না।

তোমার কি কোনো শত্রু আছে?

আমি তাদের কাউকে চিনি না। কাউকে শত্রু হিসেবে দেগে দেওয়ার দায় আমার নেই। আচ্ছা, তুমি কি আমাকে মিত্র হিসেবে অনুভব করছো? যদি না করো, তুমি নিশ্চিত হচ্ছো কিভাবে যে আমি তোমাকে শত্রু ভাবছি।

আসলে শত্রু মিত্র বলে কিছু হয় না, বন্ধু। পক্ষ। হয় তুমি বিপক্ষকে মারবে অথবা তার হাতে প্রাণ দেবে।

থ্যানাটোফোবিয়া।

আরো পথ থাকতে পারে। খুঁজছি। পাবো না জানি, তবুও। কেউ পায়নি।

তুমি তো লিখতে, তাই না?

ছাইপাঁশ লিখতাম। এখন লজ্জা করে।

আবার লেখো।

ধুর। মস্তিষ্কবন্দী বোকামিগুলো খাতাবন্দী করে অহেতুক কিছু স্থাবর বোঝা বাড়ানো। বোঝাবুঝির যদি কিছু থাকতো তাহলে মানুষের জীবন এভাবে ব্যর্থ হতো না। ইতিহাস দূষিত বৃত্তকথার পিঠে কথা সাজিয়ে এতদিন যা লিখেছি তা আসলে ইতিহাসের শরিক হওয়ার হীন প্রচেষ্টা, ওইসব শব্দের জঞ্জালে চাপা পড়ে গেছে আমাদের চৈতন্য।

আমি পুরনো খাতাগুলো রেখেছি ইঁদুরে খাবার হিসেবে।

চলো, নদীর পাড়ে যাওয়া যাক।

ওখানে এতো খোলামেলা; খুব অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন লাগে। আমাদের দরকার প্রতিরক্ষা, যাবতীয় সাজসরঞ্জাম যথা মাথার উপরে ছাদ, নিরেট দেওয়াল অর্থাৎ গুহা আর আস্তিনে লুকনো ছোরা।

চলো কফি হাউস যাওয়া যাক।

ওখানে একটাই মাত্র সিঁড়ি। পালানোর পথ সংকীর্ণ ও বিপজ্জনক। আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি এমন একটা জায়গা যেখানে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না।

৩

এনকাউন্টার অত্যন্ত ন্যায্য। পুলিশকে নপুংসক বানিয়ে রাখলে আখেরে ক্ষতিটা আমাদেরই অর্থাৎ দেশের।

তুমি মহিলা পুলিশ ব্যাপারটা ভুলে গেছো।

ওটা মানবতাবাদীদের হল্লা থামানোর কৌশল। পুলিশ শব্দটাই আসলে পুংলিঙ্গ।

লক্ষ ব্যক্তিকে রেপিস্ট সাজিয়ে পিছন থেকে গুলি করে মারা। আহা, কাজটা নিঃসন্দেহে মজার। হরিণ মারার মতো। এতে বাহিনীর মনোবলও বাড়ে। তবে সমাজবিজ্ঞানীরা

বলেন এর ফলে জনগণের মস্তিষ্কের উপর চাপ বাড়ে। প্রকৃত জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র জনগণের ভয়ের কারণ হতে পারে না। মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থনই হওয়া উচিত তার শক্তির উৎস।

বেড়ে বলেছো হে, খানিকটা সমাজতান্ত্রিকদের মতো। তবে পুলিশে চাকরি করতে করতে যেটুকু অভিজ্ঞতা তা থেকে বুঝি, ভয় ছাড়া রাষ্ট্র টেকে না। খুন করতে হলে রাষ্ট্র করবে, আর ক্ষমা করতে হলেও রাষ্ট্রই করবে। আনুগত্য কেবলমাত্র ভয় দেখিয়েই অর্জন করতে হয়।

আর হ্যাঁ, এনকাউন্টারকে আমরা ঠিক কিলিং বলি না, আমাদের পরিভাষায় ওটা ceremony of physical expulsion.

যাইহোক অ্যাসিমভ, তোমার সঙ্গে তো আজকাল দেখাই হয় না। এত ব্যস্ত তুমি! এখন কোন প্রজেক্টে কাজ করছো?

নিকোলাস, তুমি জানো আমি নাস্তিক। তান্ত্রিক নই যে তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাস রাখব। আমিও বিশ্বাস করি একটা আত্মনির্ভর, জাত্যাভিমানী রাষ্ট্রই পারে জনসাধারণকে সর্বোত্তম সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি দিতে। এর জন্য আমাদের কিছুটা মূল্য চোকাতে হতেই পারে, পার্কে সাজানো গাছের অপ্রয়োজনীয় ডালকে যেমন ছেঁটে ফেলতে হয়।

তবে কাজটা তোমাদের মতো এলোমেলো নয়, এটা বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং অত্যন্ত গোপনীয়। জেনোসাইড যেহেতু মানবকল্যাণের স্বার্থেই তাই তা হওয়া উচিত অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক ও তাৎপর্য্যপূর্ণ, যাতে তা মানুষের মনের বোঝাপড়া ও ভারসাম্যকে টালমাটাল করে না তোলে। আমার কাজ হলো ইতিহাসের ভুলগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে ত্রুটিমুক্ত নতুন প্যারাডাইম নির্মাণ। নিজেকে প্রশ্ন করতে করতে ভুলগুলো শুধরে নিয়ে বিজ্ঞান নতুনভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করে, হয়ে ওঠে আরো শক্তিশালী।

এখন আমরা তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত। সেগুলোর শ্রেণী বিভাজন হবে ব্যক্তির ধর্ম, জাতি, বর্ণ, শিক্ষা, সঙ্গ, খাদ্যরুচি, সংস্কৃতি, যৌন অভ্যাস, মানসিক প্রবণতা, দৈনন্দিন যাপন, আর্থিক সঙ্গতি ইত্যাদির ভিত্তিতে। কাজটা বেশ কঠিন এবং গণনার সামান্য ভুলচুকও আমাদের প্রার্থিত ফলাফল থেকে বহু দূরে সরিয়ে দেবে। এরপর চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া, অপ্রয়োজনীয় ক্রমিক নম্বর গুলোকে আমরা A B C অবাঞ্ছিত, বিপজ্জনক ও ক্যানসার নাম্নী তালিকাভুক্ত করছি। এরপর এগজিকিউশান। A লিস্টটা নিয়ে আমারও ধন্দ আছে। ওদেরকে নিয়ে ঠিক কি করা হবে সে বিষয়ে আমরা এখনও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। আমার প্রস্তাব একটা মিউজিয়াম তৈরি করার।

সেই এগজিকিউশান তো আমাদেরকেই করতে হবে। তোমরা স্বপ্নদ্রষ্টারা চিরকালই স্বপ্ন দেখিয়েছো; সব স্বপ্নের রঙই লাল। লাল রঙটা বোধ হয় সব থেকে বেশি চিনি আমরা।

না না। তুমি যা ভাবছো তা নয়। তোমরা বড়ো বেহায়া, নির্মম। ইতিহাসের নতুন রঙ হবে গেরুয়া এবং মানুষই তা বেছে নেবে। ত্যাগ ছাড়া কিছু পাওয়া সম্ভব নয়, বুঝলে নিকোলাস। ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে য়োহন্যং ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।

৪

The escaping tendency notion is the tendency of a substance to leave its thermodynamic state by either a physical or chemical process. It is closely related to the decrease of the Gibbs energy of the studied system which commands the spontaneous process at constant pressure and temperature.

এসব শুনে আমার কী লাভ?

অন্যভাবে ভাবো। তুমি যেটা করছো সেটা তেমন মহৎ কিছু নয়। সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যেই এই চরিত্র রয়েছে।

এটা তোমার একটা কদর্য রসিকতা, নিজেকে অতিপ্রাকৃত ভাবার নিৎসীয় দৃষ্টিভঙ্গি কবেই বাতিল। আমার কার্যকলাপকে তুমি নির্বুদ্ধিতা বলতেই পারো, কিন্তু ভণ্ডামি ভাবাটা বাড়াবাড়ি। পালানোর চেয়ে ভালো আর কোনো আত্মরক্ষার কৌশল আমার জানা নেই।

পালিয়ে যাওয়াটা মানিয়ে নেওয়ার অক্ষমতাই। মাঝে মাঝে ঘুরে তাকাতে হয় চোখে চোখ রেখে। দেখবে ভয়টা আর নেই।

তাতে শুধু গুলিটা পিছনে লাগার বদলে সামনে লাগে, এধরণের অবিমৃষ্যতাকারিতা আমি প্রশ্রয় দিই না।

যারা যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে পেরেছিলো তাদের অনেকেই বেঁচে গেছে, যদিও তা একটা চান্স-এরই ব্যাপার। ঝুঁকিটা নেব না কেন? আমি শেষপর্যন্ত নিয়তিবাদী।

পালাবে কোথায়?

জানি পালানোর পথ নেই। যারা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বর্ডার পেরিয়েছিলো, তারা ওপারেও বন্দুকধারীরই মুখোমুখি হয়েছে।

দুর্বলের নেশাগ্রস্ততা।

হা হা হা হা। এতক্ষণ বাদে ঠিক ধরেছো, আমি কেবল সম্ভাবনাকে উলটে-পালটে দেখছি, ব্যক্তি জীবন কিন্তু রাজনীতির মেটাফিজিক্সকেও প্রকাশ করে।

আপাতত কী ঠিক করলে?

আত্মগোপন। নিজের ভেতরই ঢুকিয়ে নিতে চাই জল, আলো, হাওয়া, বাতাস, পর্যাপ্ত রসদ ও বিড়ি। তারপর পাতাল প্রবেশ।

৫

সুবিমলকে গত রাতে তিন-চারবার বাথরুমে যেতে হয়েছিল। শেষবার যখন যায়, দেখে কমোডের ফ্ল্যাশটা কাজ করছে না। এষা আবার জল না দেওয়াটা একদম পছন্দ করে না। সকালেই প্লাম্বারকে ফোন করতে হবে।

দিশা ফোন করলো সকালে। সুবিমলের শালি। করপোরেশন থেকে জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে, কাজ চলছে জরুরী ভিত্তিতে। পাইপলাইন থেকে দূষিত জল বেরোচ্ছিলো। আপতকালীনভাবে পাড়ায় পাড়ায় জলের ট্যাঙ্কার পৌঁছেছে। সারা শহর জুড়ে সম্পূর্ণ বিঘ্নিত জনজীবন।

সুবিমলের সাততলার তিনকামরার ফ্ল্যাটে জল নেই। প্রাতঃকালীন ব্যাপার-স্যাপার সামলাতেও জলের দরকার। আজ অফিস যাওয়া হবে না, যদিও যাওয়াটা জরুরী ছিলো। এখন জল জোগাড়ের দুশ্চিন্তা।

সারাদিন টিভি চ্যানেলগুলোয় ভীষণ হইচই। বিরোধী নেতারা গভমেন্টকে ছিঁড়ে খাচ্ছে, জনগণের এহেন দুর্দশা তারা সইতে পারছে না। সরকারপক্ষ দমকল, জলবিভাগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ দপ্তর সবাইকে কাজে নামিয়েছে এবং প্রয়োজনে শহর খুঁড়তে সেনার সাহায্যও নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে। এষার এসব শোনার কোনো আগ্রহ নেই, টিভি খুলেছে নেহাতই জানতে যে কতক্ষণে সমাধান হচ্ছে। জীবনের চেনা ছন্দের হেরফের হলেই খুব অসহায় লাগে তার। ভয় লাগে।

অবশেষে বিকেলের দিকে ইঞ্জিনিয়াররা প্রচুর খাটাখাটনি করে একটা পচা মৃতদেহ তুলে আনতে পেরেছিলো। মেয়র টিভি ক্যামেরার সামনে হাসিমুখে বাইট দিয়েছিলো, পাগলের পাগলামি। জনতা স্বস্তিতে হাততালি দিয়েছিলো।

৬

পুরো কাণ্ডটাই তোমাদের গোয়েন্দাবিভাগের দৈন্যতাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

লোকটা A-তালিকাভুক্ত ছিলো, তাই ছাড় দেওয়া হয়েছিলো। A-দের নিয়ে স্পষ্ট কোনো নির্দেশ না থাকায় তাদের নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না তেমন।

তুমি ঠিকই বলেছো নিকোলাস। বিচক্ষণ কম্পিউটার অনেক তথ্য ঘেঁটে সিদ্ধান্তে এসেছিলো লোকটা নিরীহ। প্রত্যেক পাড়ায় একজন করে পাগল রেখে দেওয়াটা সরকারী নীতি। জনপদ, রেলস্টেশন প্রভৃতি কুকুর ও পাগলবিহীন হয়ে যাওয়াটা খুব সন্দেহজনক, লোকজন অস্বস্তি বোধ করে।

কিন্তু অ্যাসিমভ, লোকটা পাইপলাইনে ঢুকলো কীভাবে! কেনই বা ঢুকলো! ওর কাছে কি অস্ত্র-শস্ত্র ছিলো, নাহলে পাইপলাইনে এত বড়ো গর্তই বা ও করলো কী করে!

এত কিছু এখনও জানা সম্ভব হয়নি, উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত চলছে। প্রাথমিক অনুমান, লোকটা ম্যানহোলের মধ্যে আস্তানা গেড়েছিলো। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক ওই পয়েন্টেই ম্যানহোল এবং পাইপলাইনটা পাশাপাশি। তবে কোনো অস্ত-শস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি, হয়তো পাথর দিয়ে ভেঙেছে।

লোকটার কাছে কি পাতালের ম্যাপ ছিলো? এটা কোনো বিপ্লবী কান্ড-কারখানা নয়তো!

জানি না। হতে পারে পাগলামি, পাগলরা যে খেয়ালের বশে কখন কী করে ফেলে! আবার তা নাও হতে পারে, হয়তো এটা সাবোটেজ, খুব গোপনে ভেতর থেকেই সিস্টেমটাকে ধ্বংস করে দেবার চক্রান্ত, আমরা ব্যাপারটাকে হাল্কাভাবে নিচ্ছি না।

কোনও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই কখনও নিশ্ছিদ্র হতে পারে না। নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনও উপায় নেই। ভয় থাকবেই। সেটা শাসকের দিক থেকেও।

আ ব্দু ল বা রী

৬

আলো-আঁধারের কৈশোর

ভিন রাজ্য থেকে খেটে আসা এইসব ছেলেরা গত শতাব্দীর শেষ দশকে আমাদের গ্রামীণ সমাজের কাঠামোয় কিছুটা বদল আনে। গ্রামীণ সমাজের সরলতার ওপর শহুরে আধুনিকতার, জটিলতার রঙ চড়তে থাকে। গ্রামীণ সমাজের প্রথাগত কাঠামোয় ফাটল ধরে।

পাঁচ সাত ক্লাস পড়াশোনা করা বা বিদ্যালয়ের চৌকাঠ না-মাড়ানো ছেলেরা ১২-১৪ বছর বয়সে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেয়। যাওয়ার সময় চোখেমুখে থাকে গ্রামীণ সরলতা। কয়েক মাস পরে নগদ কিছু টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরে। চোখেমুখে গ্রামীণ সরলতায় টান পড়ে। এরা মূলত রাজমিস্ত্রির জোগালের কাজ করত। যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ। কৈশোরের শ্রী হারিয়ে যাওয়ারই কথা। যেতও তাই। সেই সঙ্গে মুখের কঠোরতায় মিশত শহুরে সংস্কৃতির ছাপ। শহর থেকে নিয়ে আসতো আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা। সিনেমার নায়কদের মত চুলের স্টাইল, আর কথা বলার ঢং। পোশাকে, জুতোয়, জামায়, কেমন বেমানান ভাব।

নগদ টাকা হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে কেমন যেন মেজাজ চড়ে থাকতো। বাজারে গিয়ে একটু বেশি বাজার করত। ছোট-বড় লঘু গুরু জ্ঞান না করে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষদের সঙ্গে তর্ক বাধাতো। নিজেকে জাহির করা ছিল লক্ষ্য। এই বাইরে খেটে আসা ছেলেরা সবাই যে এমন ছিল তা নয়। কেউ কেউ জমি-জিরেত কিনে বা পাকা বাড়ি করে নিজেদের সংসারের শ্রীবৃদ্ধিতে যে মন দিত না এমন নয়। তেমন ছেলেও অনেক ছিল। গ্রামের মানুষ সেই ছেলের নাম করে দৃষ্টান্ত দিয়ে নিজের ছেলেদের ভালোভাবে চলার, সংসারের হাল ধরার কথা বলতো। আমাদের গ্রামে এমনই এক সোনার ছেলে ছিল দীনু। দীন মহম্মদ। গরিব ঘরের ছেলে। কয়েকজন ভাই বোন নিয়ে তাদের বেশ বড় সংসার। বাপের দিনমজুরের টাকায় নুন আনতে পান্তা ফুরায়।

দীনুর কথা বলার আগে তখনকার গ্রামের দরিদ্রতা নিয়ে একটু বলে নিই। গত শতাব্দীর আটের দশকে আমাদের গ্রামীণ জীবনে দারিদ্র্য ছিল নিত্য সঙ্গী। এখনো আছে, তবে আগের চেয়ে কম। তখন এক অসহনীয় দরিদ্র্যতার মধ্যে বাস করতে হতো গ্রামের মানুষদের। সবার পেট পুরে দুবেলা খাবার জুটত না। বিশেষ করে বর্ষাকালে খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হতো। কতদিন দেখেছি, আমাদের পাড়ার বেশ কয়েকটি পরিবারকে ভুট্টার আটার দলু খেয়ে থাকতে। ভুট্টার আটা পানিতে গুলে ফুটিয়ে নিতে হতো। একে আমরা বলতাম দলুরান্না। তবে এই দলু খেতে সবদিন সুস্বাদু হতো না। পোকায় খাওয়া ভুট্টার আটা হত তিতকুটে, কেমন একটা গন্ধ যুক্ত। খিদে মুখে তাই অমৃত মনে করে খেয়ে নিত। দুপুরের পর রান্না করতো, তিনটে, সাড়ে তিনটে নাগাদ খেত। অনেকদিন এই খেয়ে দিন কাটাতে হতো।

অনেকের বাড়িতে রুটি তৈরি হতো, এখনকার মতো এমন সুন্দর সাদা সাদা রুটি নয়।

...এই রুটির আটাতেও ভেজাল থাকতো। মুখে দিলে কিচকিচ করত। যেন মিহিবালি মেশানো আছে। ভালো আটা ছিল না তা নয়। তবে এই দু'নম্বর আটাই বেশি থাকত।...

রাতে রেশনের চালের বা সস্তায় কেনা মোটা চালের ভাত রান্না হতো। মাঝে মাঝে এত কাঁকর থাকতো যে তা দাঁত বাঁচিয়ে খাওয়া যায় না। দাঁতের দফারফা হয়ে যেত।...

কেমন লালচে, কোনোটা বা কালচে রুটি। এই রুটির আটাতেও ভেজাল থাকতো। মুখে দিলে কিচকিচ করত। যেন মিহিবালি মেশানো আছে। ভালো আটা ছিল না তা নয়। তবে এই দু'নম্বর আটাই বেশি থাকত। গরম রুটিতে একটু গুড় মাখিয়ে জড়িয়ে দিত, বাচ্চারা সেই গুড় জড়ানো রুটি খেতে খেতে অনেক সময়ই পথে চলে আসতো। কেউ কেউ পেঁয়াজ কেটে বেশ করে লঙ্কা দিয়ে মেখে নিত। একে বলা হতো ঝালসানা বা পিঁয়াজসানা। তাতে রুটি ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে খেত। কোন কোন দিন এই পেঁয়াজ সানার সঙ্গে আলু সিদ্ধ মেখে নিত। আলুসানা আর রুটি।

রাতে রেশনের চালের বা সস্তায় কেনা মোটা চালের ভাত রান্না হতো। মাঝে মাঝে এত কাঁকর থাকতো যেত তা দাঁত বাঁচিয়ে খাওয়া যায় না। দাঁতের দফারফা হয়ে যেত। কিন্তু উপায় কি, ওই ভাতই তো জোগাড় করা দায়। রাতে খেয়ে কিছু থাকতো, পানি দিয়ে রেখে

দিত। পরদিন সকালে সেই পান্তা খেয়ে বড়োরা কাজে যেত। ছোটরা অল্প ভাত আর থালা ভর্তি আমানি পেত। মেয়েদের ভাগ্যে সব দিন এই আমানিও জুটত না। তাই ঘরে ঘরে মেয়েদের শরীরে অপুষ্টির চিহ্ন প্রকট ছিল। হাতে কোলে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। ক্ষয়ে যাওয়া শরীর, বসে যাওয়া চোখের কোণে কালি, তবু কি অদম্য জীবনীশক্তি। সুদূর ভবিষ্যতের দূরাগত সুখের আশায় বেঁচে থাকত সব। ছেলেমেয়েদের মানুষ করত আর একটা একটা কষ্টের দিন পার করে ভাবতো আরতো কয়েকটা দিন, ছেলেরা মানুষ হলেই তার সংসারের হাল ফিরবে। তখন ছেলেদের উপার্জনে বসে বসে খাওয়া। এই চরম দরিদ্রতা ছেলেমেয়েদের স্কুল যাওয়ার পথে একটা বড় অন্তরায় ছিল।

তাই অল্প বয়সেই সংসারের কাজে লেগে যেত ছেলেরা। অনেকেই ইঁটভাটায় কাজে যেত। শীতের ভোরে পাতলা জামা পরে বা গায়ে একটা সুতির চাদর দিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ইঁটভাটায় যেত। ইঁট বইতে বইতে গরম ধরে যেত শরীরে। তখন আর শীত লাগতো না। তাছাড়া কে কত জোরে দৌড়ে দৌড়ে বেশি করে ইঁট তুলতে পারবে তার অলিখিত প্রতিযোগিতা চলত। যত বেশি ইঁট বইতে পারবে তত বেশি কড়ি বা টিকা পাবে। আর এই কড়িই তো পয়সা। তাই দৌড়ে দৌড়ে ইঁট তোলা আর বেশি বেশি করে কড়ি সংগ্রহ করা। একসঙ্গে ইঁট তুলতে গিয়ে অনেকে বেশি বেশি কড়ি জোগাড় করতে পারত। যে পারত তার বেশ সুনাম হত। সপ্তাহে একদিন এই কড়ি গুনে গুনে জমা নিয়ে ইটভাটার মালিকের লোক যাকে গোমস্তা বলা হত সে টাকা দিত। একে হপ্তা দেওয়া বলা হতো। আমাদের এলাকায় মঙ্গলবার হাট, তাই মঙ্গলবার এই হপ্তা দিত। ছেলেরা হপ্তা পাওয়ায় সব টাকা বাপ মার হাতে এনে দিত। অল্প কিছু পয়সা নিজেরাও রাখত বা বাপ-মা তাদের দিত। তাই নিয়ে তাদের সেদিন খুব ফুর্তি। কেউ কিছু কিনে খেতো, কেউ বা কোমরের ঘুনসিতে সেই পয়সা ভরে রাখত। কেউ বা ছোট ব্যাঙভাঁড়ে জমা করতো। এক ভাঁড় হলে ভেঙে কোন কাজ করতো। নতুন জামা বা জুতো কিনতো।

এই শিক্ষাহীন শৈশব বড় হয়ে আমাদের সমাজকে আলোর পথ দেখাতে পারত না। এক আদিম চিরাচরিত অন্ধকারে বেঁধে রাখতো। এর জন্য শুধু দারিদ্রতা বা গ্রামের মানুষের সেকেলে চিন্তাভাবনা দায়ী তাই নয়, প্রশাসনিক উদাসীনতাও সমান দায়ী। আমাদের গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও এমন অনেক বড় বড় মুসলিমপ্রধান গ্রাম ছিল যেখানে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ছিল না। হাই স্কুল তো দূরের কথা। আর দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পে মুসলমানদের পিছিয়ে রাখা হত।

এবার দীন মোহাম্মদের কথা বলি। ছোট বয়সেই ইঁট ভাটায় ইঁট তুলে ঘাড় শক্ত করে ফেলে। তারপর টাটানগরে রাজমিস্ত্রির কাজে যায়। জোগালের কাজ। কয়েক বছরে সে হয়ে ওঠে পাকা মিস্ত্রি, তারপর হেড মিস্ত্রি। চড়চড় করে বাড়তে থাকে উপার্জন। গ্রাম থেকে আরও ছেলে নিয়ে গিয়ে নিজে কাজ ধরে করতে শুরু করে অর্থাৎ ঠিকাদার। গ্রামের বাড়িতে একটানা ছয় কুঠুরি পাকা বাড়ি করে। যে মানুষরা কয়েক বছর আগে খেতে পেত না তাদের এত বড় পাকা বাড়ি মানুষকে তাক লাগিয়ে দেয়। বেয়াড়া ছেলেকে তাই শাসন

করতে বাপ মায়েরা দীনুর উদাহরণ টানে। চাষের কাজ ছেড়ে কাঁচা টাকা উপার্জনের আশায় গ্রামের অনেক লোক ভিন রাজ্যে পাড়ি দেয়। অন্ধকারে ডুবে থাকা গ্রামে কিছুটা হলেও অন্নের সুবাস ছুটে। তবে গ্রামীণ সরলতায়, মেঠো সুরে টান পড়ে। এক অস্থির বাতাস বইতে থাকে গ্রামে।

আগে রাস্তায় দুটি ছেলে ঝগড়া করলে বড়রা থামিয়ে দিত। প্রয়োজনে একটা চড় থাপ্পড়ও দিত। বাবা-মায়েরা এ শাসন মেনে নিত। ছেলের বড় হয়ে ওঠার পথের পাথেয়

আগে রাস্তায় দুটি ছেলে ঝগড়া করলে বড়রা থামিয়ে দিত। প্রয়োজনে একটা চড় থাপ্পড়ও দিত। বাবা-মায়েরা এ শাসন মেনে নিত। ছেলের বড় হয়ে ওঠার পথের পাথেয় মনে করতো। কিন্তু নয়ের দশকে এইসব শাসন আর চললো না। ছেলের বাপ মা তেড়ে আসতে থাকলো।

মনে করতো। কিন্তু নয়ের দশকে এইসব শাসন আর চললো না। ছেলের বাপ মা তেড়ে আসতে থাকলো।

আমার বাল্যকালে গ্রামীণ জীবনে সৌজন্য ও শিষ্টাচার এর চূড়ান্ত রূপ দেখেছি। কোন প্রবীণ মানুষ কোন কথা বললে নবীনরা তা কখনও অমান্য করত না। এমনকি বয়সে বড় কোনো সাধারণ মানুষকে গ্রামের কোন মান্যগণ্য বা শিক্ষিত মানুষ কোন হুকুম করলে তা যথাসম্ভব পালন করত। এক সুন্দর সহবত ছিল সমাজে। প্রবীণদের সম্মান ছিল, মান্যগণ্য ব্যক্তির মর্যাদা ছিল। গ্রামীণ সমাজে মানবিক বাঁধন ছিল সুদৃঢ়। মিলেমিশে থাকা, একে অপরের সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে এগিয়ে আসায় কোনো বাধা ছিল না। তখন রাজনীতির মারপ্যাঁচ আমাদের গ্রামের মানুষের মন বিষিয়ে দিতে পারেনি। পরে রাজনীতি কিভাবে গ্রামীন সমাজকে বিষিয়ে দিয়েছে তা নিয়ে এই লেখার অন্যত্র আলোচনা করব।

৭

মুনিসের হাট

আমাদের গ্রামের ছেলেরা দলে দলে কাঁচা পয়সা রোজগারের আশায় ভিন রাজ্যে কাজে যায়। ফলে কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামোয় শ্রমিকের সংখ্যা কমে। চাষির ছেলে আর চাষি নয়, প্যান্ট পরা শহরে বাবু। তাই কৃষিকাজে লোকের টান পড়ে। এই শতকের গোড়ায় ভরা

কাজের মরসুমে কাজ করার লোক নাই। মাঠভরা পাট কাটার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য এই অভাব সব গ্রামে ঘটেনি। সব গ্রামের ছেলেরা ভিন রাজ্যে দলে দলে কাজে যায়নি। আমাদের গ্রাম থেকে ১০-১২ কিলোমিটার দূরের গ্রামের লোক দলে দলে আসে আমাদের গ্রামে কাজ করতে। ভোরের আলো ফোটার পরে পরেই সাইকেলে, কেউ বা বাসের ছাদে চড়ে এসে নামে আমাদের গ্রামের বাজারে। শুধু মুনিস আর মুনিস। মুনিসের হাট। কর্ম বিক্রির আশায় দলে দলে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। যেন বলছে কে নেবে গো আমায়, কে নেবে কাজে। একদিকে যেমন আমাদের গ্রামে মুনিসের অভাব তেমনি পাশের গ্রামগুলিতে মানুষের কাজের অভাব। তাই তাদের এত ভিড়। গরু ছাগলের মত মানুষ যেন পণ্য।

অল্প দু-চার বিঘা জমি। চাষ করা লোকের অভাব। ছেলেরা সব বাইরে কাজ করে। টাকা পাঠায়। বাপ বাড়িতে একা মানুষ। চাষের কাজ সামলাতে পারে না। মুনিসের হাট থেকে মুনিস নিতে হয়। তারা দুপুর বারোটা পর্যন্ত কাজ করে নগদ টাকা গুনে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। গৃহস্থের সঙ্গে কোন মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। তাই কাজের মধ্যেও চলে ফাঁকি।

আগের দিনে সূর্য উঠার কিছু পরে মাঠে মুনিস যেত, ফিরতে ফিরতে বিকাল হত। অঘ্রাণ মাসে ধান কাটা বা ঝড়ার সময় হলে তো কথাই ছিল না। তখন সময়ের হিসেব করত না কেউ।

ছোটবেলায় দেখেছি অঘ্রাণ মাসে বড় বড় খড়যুক্ত ধান। শীতের কুয়াশার মধ্যে গরুর গাড়ি নিয়ে দূরের মাঠে ধান আনতে যেত। আমরা বলতাম বিলের মাঠ। সেখানে হত কাজল গরি, হলদি গিরি, পদ্মজালি হমকেলি এমন সব ধান। এই ধানের ভাতের স্বাদ ছিল অপূর্ব। মোটা মোটা ধানের পান্তা ভাতের স্বাদই আলাদা ছিল। অনেকেই জাউ রেঁধে খেত। তখনকার দিনের সুখাদ্য যেমন আদোশা, পাকোয়ান ধুকি এই চালের আটা থেকে তৈরি হতো। হলদী গিরি, কাজল গিরি ধানের মুড়ির খুব সুখ্যাতি ছিল।

এখনকার মতো মেশিন ছিল না। হাতে তুলে ধরে আটি আটি ধান আছড়ে আছড়ে ঝরানো হত। কিছু কিছু ধানের শুধু শিসের অংশ কেটে আনা হতো। এগুলো গরুকে দিয়ে মলন দেওয়া হতো। তিন চারটে গরুকে পাশাপাশি জুড়ে পুরু করে ছড়িয়ে রাখা ধানের শীসের উপর ঘোরানো হত। একে বলে মলন দেওয়া। মলন দিয়ে ধান ঝরিয়ে নেওয়া হতো। আর বাকি খড়কে বলতো পুয়াল।

সেইসব ধান গাড়ি ভর্তি হয়ে বাড়ি আসত দুপুরের দিকে। কোন দিন বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হত। মাঠ থেকে মুনিস ফেরার তখন কোন নির্দিষ্ট সময় থাকতো না।

ধান ঝাড়ার দিনে ভোরে মুনিস আসতো। এখনকার মতো মেশিন ছিল না। হাতে তুলে ধরে আটি আটি ধান আছড়ে আছড়ে ঝরানো হত। কিছু কিছু ধানের শুধু শিষের অংশ কেটে আনা হতো। এগুলো গরুকে দিয়ে মলন দেওয়া হতো। তিন চারটে গরুকে পাশাপাশি জুড়ে পুরু করে ছড়িয়ে রাখা ধানের শীসের উপর ঘোরানো হত। একে বলে মলন দেওয়া। মলন দিয়ে ধান ঝরিয়ে নেওয়া হতো। আর বাকি খড়কে বলতো পুয়াল। এই পুয়াল গাদা দিয়ে রাখা হতো গরুকে খাওয়ানোর জন্য। এই পুয়াল গাদায় পৌষ মাসের শীতে কুকুরের বাচ্চারা আরাম করে শুত। যেমন নরম তেমনি গরম। এখন আর মলন দেওয়া ধান হয় না, তাই পুয়ালও নাই। কুকুরের বাচ্চা শীতে ঠকঠক করে কাঁপে।

বড় খড় যুক্ত ধানগুলোকে আছড়ে আছড়ে ঝরানো হত। গরুর গাড়ির চাকা দুটো খুলে নিয়ে গাড়িটা লম্বা করে পাতা হতো কিংবা ঘরের দরজার কপাট খুলে লম্বা করে ফেলা হতো ধোপার কাপড় কাচা কাঠের পাটার মতো। তার ওপর আছড়ে আছড়ে ধান ছাড়া হত। সূর্য ওঠার আগে এসে লেগে যেত কাজে। আমরা শীতের ভোরে লেপের গরমে শুয়ে শুয়ে শুনতে পেতাম ধান ঝাড়ার শব্দ। ধুপধাপ বাড়ি পড়ছে তক্তা কিংবা গাড়িতে। লেপ থেকে বেরিয়ে এসে দেখতাম অনেক ধান ঝাড়া হয়ে গেছে।

এদিকে বাড়ির মেয়েরা ধুকি (ভাপা পিঠা) তৈরি করছে। গুড়, নারকেল আর বাড়ির আতপ চালের ময়দা দিয়ে তৈরি গরম গরম ধুকি খেতে দেওয়া হতো মুনিসদের। কাজ রেখে তৃপ্তি ভরে খেত তারা। এই খাওয়ার মধ্যে একটা আলাদা আমোদ ছিল।

ধান ঝাড়ার কাজ চলত বিকেল পর্যন্ত। দুপুরে গরম ভাত, ডাল, আলু, পুকুরের মাছ দিয়ে পরিপাটি করে খেতে দেওয়া হতো।

অবশ্য মাঠে কাজ হলে জলখাবার যেত আলাদা। গমের আটার মোটা মোটা রুটি, আলু কুমরোর তরকারি বা আলু ভাজা। কোনদিন বড় স্টিলের হাড়িতে করে মসুরি, ছোলা সেদ্ধ, গুড়, পেঁয়াজ, লঙ্কা দেওয়া হত। এসব খেয়ে আঁজলা ভরে পানি খেত খাল বিলের। পানি নিয়ে মাঠে যাওয়ার চল ছিল না তখন। অবশ্য অনেকে কলসি বা ঘড়ায় করে পানি নিয়েও যেত।

শ্যালো মেশিন কাছাকাছি থাকলে ভালো, নয়তো খাল বিলের পানি প্রাণ ভরে খেত। এখন মুনিসরা মাঠে বোতলে করে পানি নিয়ে যায়। অনেকে খাবারও। গৃহস্থের কলা পাউরুটির ভরসায় বসে থাকে না।

ধান ঝাড়তে ঝাড়তে দুপুর গড়িয়ে যেত। বিকালের দিকে ধানে বাতাস দিয়ে কুটি, মাটি, আগড়া, উড়িয়ে দেওয়া হত। আমরা বলতাম ধানে চাক দেওয়া। একজন ছোট ঝাঝুরি ভরে ধান হাতের কায়দায় পাক দিয়ে ছড়িয়ে দিত। তিন-চারজন কুলো নিয়ে জোরে বাতাস দিত। কুলোর বাতাসের শা শা শব্দ উঠত, আর বাতাসে উড়ত ছোট ছোট খড়

কুটো, চিটাধান। যেখানে চাক দেওয়া হতো সেখানটা দেখতে দেখতে চকচকে সোনালী ধানে ভরে যেত। সব ধান চাক দেওয়া শেষে গোলায় ভরতে ভরতে সন্ধ্যা হয়ে আসতো। বাড়ির গৃহস্থ মুনিসদের বলতো যাও বাড়ি গিয়ে গা ধুয়ে এসো, এখানে রাতের খাওয়া-দাওয়া হবে। মুনিসরা সন্ধ্যার আঁধারে বাড়ি ফিরতো।

স্নান করে আবার আসতো। তখনও আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ আসেনি। হারিকেনের

মায়ের মুখে শুনেছি মুনিসেরা সন্ধ্যায় ধান ঝেড়ে বাড়ি গিয়ে স্নান করে এসে তারা না খাওয়া পর্যন্ত বাড়ির কোন মেয়েরা খেত না। বাড়ির গিন্নিরা খেতে দিত না। বলত যারা মা লক্ষী গোলায় ভরে দিয়ে যাচ্ছে তারা আগে খাবে তারপর তোরা। মুসলমান হলেও ধানকে বলতো মা লক্ষী, চাল কেও।

আলোয় মাটির ঘরের দাওয়ায় ভাত খেতে বসতো। খাওয়া শেষে হলে কেউ বিড়ি টানত। আর ভর পেটের ঢেকুর তুলতে তুলতে এ বছর কার জমিতে কত ধান হলো তার গল্প হত।

এখন সেসব দিন গেছে। বেলা বারোটার পর কোন মুনিস কাজ করে না। সামান্য কাজ বাকি রেখে চলে যায়। এখন মুনিসের হাতে থাকে ঘড়ি বাঁধা, কেউ কেউ মোবাইল বাজিয়ে গান শুনে আর কাজ করে। তাই অনেক রাগী গৃহস্থ বলে বসে, অফিস টাইমের বাবু, ঘড়ি দেখে কাজ করছে। মুনিসরা বিরক্ত হয়। পরদিন আর ওই গৃহস্থের কাজে যেতে চায় না।

মায়ের মুখে শুনেছি, মুনিসেরা সন্ধ্যায় ধান ঝেড়ে বাড়ি গিয়ে স্নান করে এসে তারা না খাওয়া পর্যন্ত বাড়ির কোন মেয়েরা খেত না। বাড়ির গিন্নিরা খেতে দিত না। বলত যারা মা লক্ষী গোলায় ভরে দিয়ে যাচ্ছে তারা আগে খাবে তারপর তোরা। মুসলমান হলেও ধানকে বলতো মা লক্ষী, চাল কেও।

মায়ের মুখে শোনা যে কয়দিন ধান ঝাড়া হত রাতে খাওয়ার পর আমার নানার হুকুমে প্রত্যেক মুনিসকে এক বাটি করে গরম দুধ খেতে দেওয়া হতো। তারা তখন মুনিস নয়, আত্মীয়। মনিবের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল বড়ই মধুর। তবে সব বাড়িতে এমনটা হতো তা নয়। কিন্তু প্রায় গৃহস্থবাড়িতে ধান তোলার সময়ে এ ছবি দেখা যেত।

এখন মুনিসের জলখাবার কলা পাউরুটি। কিংবা খাওয়ার জন্য মুনিস খরচের সাথে টাকা ধরিয়ে দেওয়া হয়। সেই আত্মিক টানটা তাই আর নেই। তার ছেঁড়া সেতারে কোন সুর ওঠেনা। ছন্দহীন মনোকষ্টে দিনযাপন।

অভিষেক মুখোপাধ্যায়
চরিত চচ্চড়ি
৮

তামিল সেলভান

তামিল সেলভান এর সাথে আমার আলাপ সুচোউ আসার পর। আমাদের ডিপার্টমেন্টে সে বছর চার ভারতীয়। আমি পূর্ব ভারতের মানুষ। সত্যম নেগী উত্তরাখণ্ডের ছেলে। মুম্বাইয়ের পিয়ুষ সিংহ। আর চেন্নাই থেকে তামিল। আমার প্রথমেই তামিলের সাথে বন্ধুত্ব হয়। আমার জীবনের দুটি বছর কেটেছে তামিলনাড়ুর পাশে পন্ডিচেরিতে। আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় বছরগুলির দুটি তা। দক্ষিণ ভারতের মানুষের ভালোবাসা, আপন করে নেওয়া আমার ভেতরে এক চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। ফলে তামিলকে দেখে আমার সেই দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাদারহুড় জেগে ওঠে। উজ্জ্বল কালো চেহারার ছেলে সে। চেহারা একটু মোটার দিকে কিন্তু শক্তিশালী। আর সহজ সরল তামিল জাতীয়তাবাদী। দক্ষিণ ভারতে এমন মানুষজন দেখে আমি অভ্যস্ত। কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্টে প্রায় ৩৪টি দেশের সদস্য রয়েছে। তামিলের টিপিকাল ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ তারা ধরতে পারে না। আমার ডরমিটরি মেট নাইজেরিয়ার মার্টিন এসে বলে যে তামিল কি বলছে তা তার বোঝার বাইরে। আমার মনে পড়ে যায় পন্ডিচেরি প্রথম ক্লাসের স্মৃতি। প্রথমবার ক্লাসে গেছি। পুরুষোত্তমন স্যার পড়িয়ে চলেছেন। আর আমি একটা শব্দও বুঝছি না। আতঙ্কিত হয়ে ভাবছি, এই দেশে দু'বছর থাকবো কি করে।

তামিলের সাথে প্রথমেই বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে আসে আমাদের ডিপার্টমেন্টের আফ্রিকার ছাত্র-ছাত্রীরা। তারা বলিউড দেখে ভারত চেনে। মার্টিন যেমন আমায় ভারতীয় জেনে প্রথম দিনই বলেছিল থ্রি ইডিয়টস এর কথা। তার মতে আমার আচরণ রানঝোরদাস শামকদাস চাঁচর ওরফে ফুংসুক ওয়াংরুর মতন। সে বলে 'তোমরা ভারতীয়রা এত নিশ্চিন্ত থাকো কি করে?' তার বড় পছন্দ তামিল কে। সে বলে ভারতীয়দের মধ্যে কালো মানুষ আছে তা তার ধারণার বাইরে ছিল। তার মতে 'শুধুমাত্র চুলের জন্যই তামিল ভারতীয়। নইলে সে তো ঠিক আফ্রিকান।' তামিল অন্যদিকে নিজেকে তামিল হেরিটেজ এর অংশ বলে জানে। তার তাতে বিশাল গর্ব। আমাদের কোর্সের আর্মেনিয়ার মেয়েটি এসে একদিন বলে 'তোমাদের দেশে কি মানুষের নাম, ভাষা আর জায়গার নাম এক?' আমি তাতে হাঁহাঁ করে উঠলে, সে তামিলের উদাহরণ দেয়। নাম তামিল, ভাষা তামিল, জায়গা তামিল। পিয়ুষ যেমন একদিন আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, তামিল সেলভান নামের মানে। আমি জানাই সেলভান এর অর্থ ছেলে। পিয়ুষ দেখি হকচকিয়ে যায়। 'ওর নাম তাহলে তামিল ছেলে'। আমি নিঃশব্দে মাথা নাড়ি। আমাদের ফ্রেশারস ওয়েলকাম পার্টিতে তামিল তামিলে গান গায়, তার পিছনে জ্বলজ্বল করতে থাকে তামিলনাড়ুর ছবি।

এই সময়ে শীতের ছুটিতে আমি ঠিক করেছি টেরাকোটা ওয়ারিয়ার্স দেখতে যাব শিয়ান। এমনিতে শিয়ান অবস্থিত সেন্ট্রাল চায়নায়। শীতে এখানে তাপমাত্রা মোটামুটি ৪ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকে। চীনে শীত এমনিতে ভয়াবহ। বেশিরভাগ জায়গায় মাইনাসে আবহাওয়া। বরফে মুড়ে যায়। একমাত্র কুন্মিং এর দিকটা বাদে। সেখানে আবার পূর্ব চীন থেকে যেতে লেগে যায় প্রায় ৩৮ ঘন্টা স্লো ট্রেনে। ৩৮ ঘণ্টার টানা জেনারেল কামরায় বসে যাওয়া যে কতটা ভয়াবহ ভেবে সেই প্ল্যান বাতিল করি। হাতে পয়সাও নেই, শীতের রাজ্যে যাওয়ার পোশাক কেনার। ফলে দশ দিনের জন্য সিয়ান যাবার পরিকল্পনা করে বসি। আমি মার্টিন, ইমানুয়েল বসে এই নিয়ে কথা বলছি। সকলেই জানে আমি একা ঘুরতে ভালোবাসি। এমতাবস্থায় তামিল ঘরে ঢোকে এবং অন্তত দশবার 'আমার এখানে ভালো লাগছে না', 'একা ঘরে বসে থাকতে পারছি না', 'অন্য কোন ভাল বন্ধু নেই', 'চীনদেশ দেখা হবে না' ইত্যাদি বলে আমার সাথে জুড়ে যাবার বায়না করতে থাকে। মার্টিন সে অবস্থায় ইয়ার্কি করে তামিলকে আমাদের কোর্স এরই আমেরিকান ড্রেসডেন কে নিয়ে বালখিল্য মজা করছে। তামিল ও ড্রেসডেন ভালো বন্ধু। মার্টিন যেই না বলেছে তাদের প্রেমের সম্ভাবনা নিয়ে, তখনই তামিল গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করে দেয় 'ড্রেসডেন আমার মায়ের মত'। গোটা ঘরে নৈঃশব্দ্য। আমি বোঝাই 'তামিল, বয়সে বড় নয় এমন কোন মহিলাকে মায়ের মত বলা আদতে কিন্তু তাকে অপমান।' তামিলের তা মাথায় ঢোকে না। 'মায়ের মত রেস্পেক্ট করলে বলা যাবে না নাকি'। কি বলব বুঝতে পারছি না আমরা; এই মুহূর্তে তামিল যুদ্ধজয়ীর মতো পকেট থেকে বার করে মোবাইল ফোন। মার্টিন এর দিকে সে ফোনের একটি ছবি ঘুরিয়ে দেখিয়ে বলে 'দিস ইজ মাই গার্লফ্রেন্ড, ব্রো। সি হার কালার।' মেয়ের ছবি ধবধবে সাদা। আমি আর মার্টিন মুখ চাওয়া চাওয়ি

করছি এই উজবুক তথা নির্লজ্জের এমন রেসিস্ট প্লেজার দেখে। তাও আবার একজন কালো মানুষের মুখে। তামিলের মুখে অবশ্য তখন নির্মম বিজয়ীর হাসি। স্পষ্ট ভাবে সে ঘোষণা করে, যে এই সাদা ধবধবে মেয়ে তাকে তিনবার ফেসবুকে 'রিজেক্ট' করেছে। সে চিনে আসায় সাদা ধবধবে তাকে অবশেষে প্রেম করতে রাজি হয়েছে, সে জানায়। আমাদের আঁতকে দিয়ে সে এও বলে দেয়, কছুদিনের মধ্যে তার মা যাবে বিয়ের কথা বলতে মেয়ের বাড়ি। মার্টিন যখন বলে 'তুমি দেখা না করেই...'। তামিল তার কথা শেষ না হতে দিয়েই উড়িয়ে দেয়। শুধু বলে 'ব্রো'।

'দিস ইজ মাই গার্লফ্রেন্ড, ব্রো। সি হার কালার।' মেয়ের ছবি ধবধবে সাদা। আমি আর মার্টিন মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি এই উজবুক তথা নির্লজ্জের মত রেসিস্ট প্লেজার দেখে। তাও আবার একজন কালো মানুষের মুখে। তামিলের মুখে অবশ্য তখন নির্মম বিজয়ীর হাসি। স্পষ্ট ভাবে সে ঘোষণা করে, যে এই সাদা ধবধবে মেয়ে তাকে তিনবার ফেসবুকে 'রিজেক্ট' করেছে। সে চিনে আসায় সাদা ধবধবে তাকে অবশেষে প্রেম করতে রাজি হয়েছে, সে জানায়। আমাদের আঁতকে দিয়ে সে এও বলে দেয়, কছুদিনের মধ্যে তার মা যাবে বিয়ের কথা বলতে মেয়ের বাড়ি।

যাইহোক বাধ্য হয়ে তামিল কে নিয়ে বেরিয়েছি শিয়ানের পথে। প্রথমে প্ল্যান, সকালবেলা পাশের উশি শহরে যাবো। সেখানে সারা সকাল ঘুরে রাতে পৌঁছাবো আবার রেলস্টেশনে। সারারাত স্টেশনে ঘুমিয়ে ভোরবেলা জেনারেল কামরায় বসে যাব সিয়ান। তামিল কে আগেভাগে সাবধান করে রেখেছি কষ্টের ব্যাপারে। সে বলেছে 'ব্রো, আই আম এ স্ট্রং তামিল ম্যান, ডোন্ট ওয়ারি'। আমি তো মোটামুটি নিশ্চিন্ত। দুর্বল পেটরোগা বাঙালি পারলে তামিল এর মতো শক্তিশালী মানুষ এর কাছে নির্ঘাত এসব নস্যি। ভোরবেলা উসির জন্য বেরোবো, দেখি তামিলের হাতে এক বিশাল বড় সুটকেস। আমি বলছি 'এত বড় সুটকেস নিয়ে কি হাঁটতে অসুবিধা হবে না'! সে চোখে তাচ্ছিল্যের ইশারা করে আর শুধু একটা আওয়াজ করে মুখে বলে 'ব্রো'। ফলে আর আমি শক্তিশালী তামিল মানুষকে বেশি ঘাঁটাই না।

সকাল থেকে উশিতে ঘুরছি। তামিলের হাতে বিশাল ব্যাগ। এমতাবস্থায় দেখতে পাই প্রচুর অ্যান্টিক জিনিসের দোকান। তামিল সেখানে খুঁজে পেয়ে যায় বিখ্যাত সুইডিশ

ব্র্যান্ডের ঘড়ি। ফুটপাতে বিক্রি হচ্ছে। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে 'মাত্র ২০০০, ব্রো'। আমার বাঙালি সন্দেহভাজন মন। বলে বসি 'ফুটপাতে এসব বিক্রি হচ্ছে তামিল, নকল হলে?' সে আমার দিকে অবজ্ঞায় তাকায়। শুধু বলে 'ব্রো'। আমি বুঝে যাই সুইডিশ ঘড়ির ব্যাপারে তামিলের সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে না কোনভাবেই।

কিন্তু মোদ্দা সমস্যা তৈরি হয় রেল স্টেশনে পৌঁছে। চীনের রেলস্টেশনে রাতের শোবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই খাট নেই। তামিল তা ঠিক মেনে নিতে পারে না। সে আমায় বলতে থাকে 'ব্রো, শোব কোথায়?' তাকে রেলস্টেশনে রাখা সারসার চেয়ার শোবার জন্য ভীষণ আরামদায়ক আর উপযুক্ত বলে খুশি করতে চাই। সে আমায় একেবারেই বিশ্বাস করতে চায় না। রাগতভাবে বলে ওঠে 'ব্রো'। আমি দমে যাই। এরপর দেখা যায় তামিল সেলভান এর জেনারেল কামরা এ ঘুমোবার ব্যাপারে ধারণাও অন্যদের থেকে আলাদা। সে যখন জানতে পারে, যে জেনারেল কামরায় বসে বসে ঘুমাতে হয় তখন সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে 'ব্রো'। সে ভেবে উঠতে পারে না সারাদিন উসি তে ঘুরে, ২৪ ঘন্টা ট্রেনে বসে সে সিয়ান জীবিত অবস্থায় পৌঁছোবে কি করে। সে সিদ্ধান্ত নেয় 'ব্রো, এভাবে তো যাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু যেহেতু আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি তাই একটু কনসিডার করতে পারি। কিন্তু তার জন্য আমাদের ডরমিটরি ছেড়ে ভালো হোটেলে ঘুমোতে হবে।' আমি তাকে বোঝাই, আমার ভ্রমনের দর্শন। তামিল সেসব এক ফুঁ এ উড়িয়ে বলে দেয় 'ব্রো, ডরমিটরি বাতিল'। আমি একটু দূরে গিয়ে চেয়ারে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করি। তার আগে তামিল কে উইচ্যাট একটা মেসেজ করে তার অপশনগুলো ক্লিয়ার করে দিই। তাকে জানাই, তার হাতে তিনটে অপশন। আমার সাথে আমার মর্জি মতো ঘোরা, আমায় ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ একা ঘোরা অথবা আলাদা আলাদা জায়গায় থেকে আলাদা মাধ্যমে ভ্রমণ করে একসাথে ঘোরা। এটাও বলে দিই 'বন্ধু গেলে বন্ধু পাব কিন্তু বেড়াবার সুযোগ নষ্ট হয়ে গেলে তা আর ফিরবে না, অগত্যা...।' নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ি তারপর। সকালে উঠে আমার ট্রেনের টিকিট চাইতে গেলে তামিল বলে যে তা সে কোনমতেই দেবে না। আমি যাতে তাকে ছেড়ে পালাতে না পারি।

সিয়ান ঘোরা হয় এরপর। প্রতিদিন বিকেল ৫টা বাজলেই তামিল দৌড়য় ডরমিটরির ঘরে। শেষ রাতে যখন আমি ফিরি দেখতে পাই তামিল বিছানায় বসে তামিল ভাষায় তামিলনাড়ুর প্রেমিকার জন্য গান গেয়ে চলেছে। আমি ঢোকামাত্র রুমের বাকি ৪ চৈনিক রুমমেট আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকায়। আমি সেই সবে পাত্তা না দিয়ে তামিলের দিকে ইঙ্গিতে খুব ভালো হচ্ছে বুঝিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। এভাবে দিন দশেক পর ট্রেনে করে আবার ফিরছি। আমার এবং তামিলের অন্য জায়গায় সিট। দেখতে পাচ্ছি সেই গোটা ট্রেনের চৈনিকরা 'ইন্দুরান ইন্দুরান' বলে কিছু দেখতে ছুটছে। গিয়ে দেখছি তামিল তখনো তার হেঁড়ে গলায় তামিল প্রেমিকার জন্য তামিল গান গাইছে। আর আমায় দেখে একগাল হেসে বলছে 'ব্রো'।

পারিপার্শ্বিকতায় সিরাজকে বিচার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাঙালি সমাজ

জাহিরুল হাসান

পূর্বা, ২০১৮, ৩০০/-

সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায়গুণাকারের জীবনবৃত্তান্ত' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম জীবনীমূলক রচনা। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। তারও আগে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার পাতায় মুদ্রিত হয়েছিল এই জীবনকথা। সেদিক থেকে বাংলা জীবনী বিষয়ক রচনার কালক্রম শতাব্দীর সীমা অতিক্রম করেছে বহু দিন আগেই; আর কিছুদিন পর তা দ্বিশতবর্ষের দুয়ার স্পর্শ করবে। প্রসারিত এই কালসীমায় জীবনীগ্রন্থ রচনা নিয়ে হয়েছে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। কোনো কোনো জীবনীকার জোর দিয়েছেন উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পুরুষের জীবনের ইতিবৃত্ত কথনে; কেউ কেউ আবার জীবনবৃত্তান্তের পাশাপাশি সমান প্রযত্নে উপস্থাপন করেছেন

সমকালীন যুগ পরিবেশকে; সময়ের ঘাত প্রতিঘাত ও ব্যক্তির উপর তার প্রতিক্রিয়ার সমীকরণ প্রণয়ণ করেছেন তাঁরা। আলোচ্য 'সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাঙালি' সমাজ এই দ্বিতীয় শ্রেণির রচনা। বইটির লেখক সাহিত্য-গবেষক, ইতিহাসবিদ জাহিরুল হাসান।

জাহিরুল হাসান জীবনীগ্রন্থ রচনায় সিদ্ধহস্ত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ও সাহিত্য অকাদেমি-র জীবনগ্রন্থমালায় তাঁর কাজী আবদুল ওদুদ, জসীম উদ্‌দীন ও রেজাউল করীম কেন্দ্রিক রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর বাইরেও রয়েছে রোকেয়ার জীবন ও কৃতি বিষয়ক সৃষ্টি 'মুসলিম নারী রোকেয়া এবং তাঁর আগে ও পরে'। কালক্রমের নিরিখে 'সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাঙালি সমাজ' জীবনীগ্রন্থ ধারায় অদ্যাবধি জাহিরুল হাসানের শেষ সংযোজন। গ্রন্থটি সময়ের সাপেক্ষে যেমন সাম্প্রতিক, তেমনি রচনা বৈশিষ্ট্যেও অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

কাজী আবদুল ওদুদ, জসীম উদ্‌দীন বা রেজাউল করীম-দের ইতিবৃত্ত কথনের ক্ষেত্রে ছিল প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা। কমবেশি ছকে বাধা পথে অগ্রসর হতে হয়েছিল। হয়তো এই পথে হেঁটে ততটা তৃপ্ত হতে পারেননি লেখক। তাই প্রাতিষ্ঠানিকতার বেড়া ডিঙিয়ে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে জীবনীগ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রণীত হয়েছিল 'মুসলিম নারী রোকেয়া এবং তাঁর আগে ও পরে'। গ্রন্থটির রচনা-সাফল্যে প্রাণিত হয়ে 'সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাঙালি সমাজ' রচনায় উদ্যোগী হয়ে থাকবেন চিন্তাবিদ জাহিরুল হাসান।

নাম থেকেই সুস্পষ্ট, গ্রন্থটি নিছক লেখক সিরাজের ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত নয়। ইতিহাসের পটভূমিতে লেখককে প্রতিস্থাপন করে বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা রয়েছে এখানে। এই প্রচেষ্টার ফসল ফলেছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। একদিকে সময়ের বহমানতা, অন্যদিকে বহমান সময়ের স্রোতধারায় স্নাত ব্যক্তিমনের উদ্ভাসন; দুই এরই অসামান্য রূপায়ণে ঋদ্ধ এই গ্রন্থ।

কথাকার সিরাজ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারায় অনন্য সংযোজন। তাঁর এমন অনন্যতা অনায়াস লব্ধ কোনো বিষয় নয়। অজস্র রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে ইঞ্চি ইঞ্চি জমি একটু একটু করে ক্রয় করতে হয়েছিল তাঁকে। লেখক বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রণয়ন করেছেন সে অর্জনের ইতিহাস; আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন ব্যক্তি সিরাজকে তাঁর পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশের সাপেক্ষে বিচার করে। সর্বোপরি ডুব সাঁতার দিয়েছেন লেখকের মানসলোকের গহীন সমুদ্রে। বাংলা ও বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের প্রামাণ্য উপস্থাপন এখানে পাঠকের জন্য অতিরিক্ত উপঢৌকন স্বরূপ। গ্রন্থটির মুদ্রণ সৌকর্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে এর প্রচ্ছদ-ভাবনা মনে সেভাবে দাগ কাটে না।

—এ টি এম সহাদাতুল্লা

ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন কিছু বীক্ষণ

সাহিত্য
পরিষৎ-পত্রিকা
১২৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
১৪২৬, ২৫০/-

বাঙালির সাংস্কৃতিক মন ও মননের পীঠস্থান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। সেই প্রথম দিন থেকে এই প্রতিষ্ঠান বাঙালি সংস্কৃতির সংগঠনে কাজ করে আসছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই কৃত্যাদির ধারায় অনন্য সংযোজন ত্রৈমাসিক সাহিত-পরিষৎ-পত্রিকা। একশত ছাব্বিশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে চলেছে পত্রিকাটি; প্রকাশিত হয়েছে সাধারণ সংখ্যার পাশাপাশি বেশ কিছু বিশেষ সংখ্যা। প্রকাশিত এই সব সাধারণ বা বিশেষ যে কোনো সংখ্যার সাপেক্ষে সদ্য প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংখ্যা (১২৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৪২৬) অনন্যতায় ভাস্বর।

কোভিদ-১৯ এর দুরন্ত অভিঘাতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের জন্মের দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এপার বাংলা ওপার বাংলা জুড়ে যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হয়েছে তাতে অনিবার্যভাবে প্রাধান্য পেয়েছে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের বিষয়টি। ইতিপূর্বেই আলোচ্যক্ষেত্রে নিজেদেরকে নিংড়ে দিয়েছিলেন বেশ কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকমণ্ডলী; নন্দিত হয়েছিল তাঁদের সে নিবেদন। পরিষৎ কর্তৃপক্ষকে তাই একটু অন্যরকম করে পরিকল্পনা করতে হয়। এক্ষেত্রে তাঁদের পরিকল্পনা অনেকাংশে স্পর্শ করেছে আমাদের প্রত্যাশার তলদেশ।

বিদ্যাসাগরের মহাপ্রয়াণের প্রেক্ষিতে সেদিনের বাঙালি নিংড়ে দিয়েছিল যে শোকাশ্রু তার কিছু কিছুকে ধরে রাখা হয়েছিল শব্দ ও বাক্যের আধারে। অসামান্য সেইসব উচ্চারণকে সংকলিত করা হয়েছে এখানে; যা আগ্রহী পাঠকের পক্ষে গুপ্তধন লাভের সমরূপ। এখানে সংযোজিত হয়েছে বিদ্যাসাগর সংশ্লিষ্ট বিবিধ মূল্যবান নথিপত্রের প্রতিলিপি।

একদিকে রয়েছে একালের মান্য ব্যক্তিবর্গের বিদ্যাসাগর-বীক্ষণ, অন্যদিকে দুর্লভ সব নথি ও দুষ্প্রাপ্য রচনার সমন্বয়ে অলংকৃত করা হয়েছে পত্রিকার অঙ্গনকে। ব্যক্তিগত বীক্ষণ অংশ বৈচিত্র্যময়। অমিয়কুমার সামন্ত (সমাজে ও পরিবারে বিপন্ন, বিক্ষত বিদ্যাসাগর), বারিদবরণ ঘোষ (বিদ্যাসাগরের দাম্পত্যজীবন), আশিষ খাস্তগীর (মদনমোহন ও বিদ্যাসাগর মিলন-বিরহ কথা) অবগাহন করেছেন ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের মনের গভীরে; প্রসারিত করেছেন বিদ্যাসাগর সংশ্লিষ্ট আমাদের প্রতীতির পরিসরকে। রতনকুমার নন্দীর 'সমাজজীবনে বিদ্যাসাগর' সামাজিক পুরুষ বিদ্যাসাগরের জীবন ও কৃতির অন্তরঙ্গ অন্বেষণ, উপভোগ্য উপস্থাপন। স্বপন বসুর 'ব্রাহ্মবিবাহ, তিন আইনে বিয়ে ও বিদ্যাসাগর', পঙ্কজকুমার দত্তের 'বিদ্যাসাগর : বঙ্গ ইতিহাসচর্চার এক অগ্রপথিক', ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় বিদ্যাসাগরের অবদান ও পরবর্তী ধারা' প্রভৃতিতে বিদ্যাসাগর-মনীষাকে স্পর্শ করা হয়েছে বিশ্বস্ততার সঙ্গে। পুনর্মুদ্রণ ও নথিপত্র অংশ আক্ষরিক অর্থেই মণিমুক্তায় সমৃদ্ধ। এখানে রয়েছে সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত বিদ্যাসাগর সংগ্রহের সম্পূর্ণ বিবরণ, বিদ্যাসাগর রচিত এবং বিদ্যাসাগর বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের তালিকা, বিদ্যাসাগর বিষয়ক নথি পত্রাদির হদিস প্রভৃতি। বিদ্যাসাগরের মহাপ্রয়াণের প্রেক্ষিতে সেদিনের বাঙালি নিংড়ে দিয়েছিল যে শোকাশ্রু তার কিছু কিছুকে ধরে রাখা হয়েছিল শব্দ ও বাক্যের আধারে। অসামান্য সেইসব উচ্চারণকে সংকলিত করা হয়েছে এখানে; যা আগ্রহী পাঠকের পক্ষে গুপ্তধন লাভের সমরূপ। এখানে সংযোজিত হয়েছে বিদ্যাসাগর সংশ্লিষ্ট বিবিধ মূল্যবান নথিপত্রের প্রতিলিপি।

রয়্যাল সাইজের ৭১৬ পৃষ্ঠা সমন্বিত একটি সংখ্যা। ইতিপূর্বে পরিষৎ-পত্রিকার এমন বৃহৎ রূপ লক্ষ করা যায়নি। সেদিক থেকেও সংখ্যাটির অভিনবত্ব রয়েছে। তবে এমন অভিনবত্বের অন্তরাল ভেদ করে কিন্তু বেশ একটু অপ্রিয়তার অনুভূতিও বিচ্ছুরিত হয়। প্রবন্ধ-নিবন্ধ অংশে ব্যক্তি বিদ্যাসাগর ও তাঁর কৃতির মূল্যায়নে সামগ্রিকতার ছাপ নেই; একান্ত ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন কিছু বীক্ষণই এখানে শেষকথা হয়ে থেকেছে; যা কাম্য ছিল না। এক্ষেত্রে সম্পাদকীয় দপ্তরের ক্রীয়াশীলতার অভাব রয়েছে বলে মনে হয়।

—মীজানুর রহমান

সফিয়া খাতুন
সভ্যতা ও আর্থিক অবস্থা

আজকাল যুবকদিগকে হিসাবী (Economic) কথার একটা অদ্ভুত কু-অর্থ করতে দেখি। যদি কাউকে কেউ বলে যে লোকটী বড় হিসাবী, তাহলে যুবকরা তার অর্থ করে নেন যে, লোকটা হিসাবী অর্থাৎ কৃপণ। অনেক সময় আমরা বলে থাকি ''লোকটা খরচের বেলায় কিন্তু বড় হিসেব করে খরচ করে।'' এ কথার অর্থ এই নয় যে, লোকটী টাকা পয়সা খরচ করতে চায় না। তার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ঠিক তার উল্টা; তবে বাজে কাজে খরচ করে না। অনেক অর্থ-নৈতিকরা অর্থ-নীতিকে দুটা ভাগ করতে চেয়েছেন। তাঁদের কেহ কেহ বলছেন যে, একটা নিষ্কলঙ্ক অর্থনীতি (Pure-economy) আর একটী কলঙ্কিত অর্থনীতি (Vulgar)।

এই যে লোকটী বাজে কাজে টাকার শ্রাদ্ধ করে না, তাকে তাঁরা বলেন, ''পিওর ইকনমিক।'' আর ''সাইলকের'' মত যারা শুধু টাকা জমিয়ে রাখে, খরচ করতে জানে না, এবং নিজেও খেতে জানে না, শুধু লোহার সিন্দুক টাকা দিয়া পূরছে— তাকে তাঁরা ''ভল্‌গার ইকনমিক'' বলতে চান।

মানলাম, পণ্ডিতদের কথাই ঠিক। কিন্তু যে লোকটা টাকাকে জলের মত মনে করে ব্যয় করে, —নিজের ভোগ বিলাসের জন্য যেমন খরচ করে, পরের জন্যও তেমনি করে থাকে—তার অর্থনীতিকে আমি কি উপাধি দেব?

সংসারে ত এই তিন রকমেরই লোক সচরাচর দেখতে পাই। একজন খুবই টাকা উপার্জ্জন করছে কিন্তু সে খরচ করতে জানে না, বা নিজেও খেতে জানে না। আর এক রকম লোক যেমনি উপার্জ্জন করতে জানে, তেমনি ব্যয়ও করে থাকে। কিন্তু তার খরচ করার কোন সংযম নেই। আর এক রকম লোক আছে, সে বেশ খরচ করতে জানে; কিন্তু সেটা খুব স্থির ধীর ও চঞ্চলতাশূন্য।

তাই মনে হয়, দুনিয়ায় ''পিওর ইকনমি'' বলে কোন একটা জিনিস নেই। ওটা বুড়দের মনের এক বায়ু। তাঁরা আর্টের বেলায়ও ঠিক তেমনি ''পিওর আর্ট'' বলে চেচিঁয়ে থাকেন।

সোজা কথায় ''ইকনমিক'' অর্থ এই—ইকনমিক লোকটী বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে মানুষের হালে, আর দশজন লোক যেমনি চলে থাকে ঠিক তেমনি ভাবে, চলে থাকে। মানুষ সংসারে যে সব সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে আসে, অর্থাৎ বিশ্বপ্রভু আমাদের জন্য যে সব সুখ-সুবিধা উপভোগ করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তা যথাযথ ভাবে উপভোগ করে থাকে।

বিষয়টী আর একটু পরিষ্কার করেই বলিলে যেন ভাল হয়। অনেকে হয় ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, মানুষের হালে থাকার কথা যে লেখিকা বলছেন, সেই হালের Standardটা কি? আর একজন হয় ত তার উত্তর দিবেন যে, যখনকার যে সভ্যতা দেশে এসে দেখা দেয়, ঠিক তার সঙ্গে মিশ খেয়ে চলার জন্য যা দরকার, সেটাই হচ্ছে তার Standard.

আবার একদল লোক হয় ত বলবেন, ''যখন যে সভ্যতা আসবে, তাকেই যে বরণ করে নিতে হবে, তার মানে কি? সভ্যতার একটী মাপ কাঠি থাকা দরকার।"

আমিও বলি তাই। হাঁ সভ্যতার একটা মাপকাটি থাকা চাই বই কি। আমাদের মাপকাঠি ঠিক নেই বলেই ত দেশের এত দুর্দ্দশা। মাপকাটি বলতে এই বলছি না যে, মান্ধাতার আমল হতে যে প্রথা চলে আসছে, তাই রক্ষা করতে হবে। আমি মাপকাটির কথা আর্থিক দিক হতে বলছি।

দেশের সভ্যতা যেন দেশের আর্থিক অবস্থা ডিঙ্গিয়ে না যায়। যে দেশের সভ্যতার সঙ্গে তার আর্থিক অবস্থার স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ আছে, সেখানে দুর্ভিক্ষ অনটন প্রভৃতি খুব কমই দেখা যায়।

সভ্যতা জিনিষটা জলের মত—যখন যেভাবে রাখ সে ভাবেই থাকবে। ঘটিতে রাখ ঠিক ঘটিই হয়ে যাবে। আর একটা চৌবাচ্চায় রাখ, দেখবে, ঠিক চৌবাচ্চাই হয়ে গেছে। কিন্তু তার দ্রব্যগুণের কোন পরিবর্ত্তন হবে না।

ঠাকুমাদের মুখে শুনেছি। তাদের বুড়রা না কি আট টাকা মাসিক বেতনে রাজসরকারে কাজ করেছেন। তাতে তাদের বেশ চলে যেত। তার মানে ঐ যে, তখনকার দিনে এই আটটা টাকা ছিল অটশত টাকার সমান। তখনকার দিনে এই আট টাকাই আটশত টাকার কাজ দিত। অনেকে হয় ত বলবেন তা হয় কি করে? এর উত্তরে আমি বলব, ঐ যে গোড়ায় ছিল সভ্যতা। তখনকার আট টাকা মূল্যের সভ্যতা আজ আমরা ৮শত টাকা দিয়ে কিনছি, আর একদিন হয় ত তাই-ই ৮ হাজার দিয়ে কিনব!

তার মানে সভ্যতা জিনিষটা জলের মত—যখন যেভাবে রাখ সে ভাবেই থাকবে। ঘটিতে রাখ ঠিক ঘটিই হয়ে যাবে, আর একটা চৌবাচ্চায় রাখ, দেখবে, ঠিক চৌবাচ্চাই হয়ে গেছে। কিন্তু তার দ্রব্যগুণের কোন পরিবর্ত্তন হবে না।

সে রকম সভ্যতাকে তুমি মণি মাণিক্য জহরতাদি দ্বারা সাজিয়ে রাখ, বা শুধু শাঁখা সিন্দুরই দেও, তাতে তার সত্যটুকুর কোন পরিবর্ত্তন হবে না—সে যা তাই থেকে যাবে। সে নিত্য নূতন ও নিত্য পুরাতন। তার (সভ্যতার) বাজ্যিক রূপটাই হচ্ছে দেশের আর্থিক অবস্থা এবং তার মাল মসলা হল দেশের Industry ও Science.

সোনারূপা মণি মাণিক্য না হলে যেমন নারীর রূপের ঝঙ্কার দেখাবার সুযোগ হয় না, সেরূপ দেশের সভ্যতাকে সাজিয়ে তুলতে হলে শ্রমশিল্প ও বিজ্ঞান না হলে চলে না।

তাই বলি ইণ্ডাষ্ট্রী ও সায়েন্সের যত প্রসার হবে, সভ্যতার মাপকাটিও তেমনি প্রসার করতে পারবে, তা নৈলে নয়। শুধু সভ্যতা নিয়ে ইংলণ্ড, আমেরিকা কি জাপান হওয়া যায় না। তা হতে পারবে সেদিন, যেদিন হতে ঘরে ঘরে জাপানী বা আমেরিকান ইণ্ডাষ্ট্রী দেখতে পাবে। এক ইণ্ডাষ্ট্রী দ্বারা দেশের অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। প্রথমতঃ বেকার সমস্যা। যে লোকগুলি বেকার বসে আছে, তাদের সমস্তই খরচের ঘরে ধরা হয়। ধরুন এই পৃথিবীটী একটী মহাজনের খাতা। তার মূল তহবিল হল সমস্ত মানব জাতিটা। ভগবান ঠাকুর এই মূল ধন নিয়ে ব্যবসা করতে বসেছেন। ইণ্ডাষ্ট্রী ও সায়েন্স হচ্ছে মাল পত্র (Goods)।

ভাবুন এখন, এই মানব জাতির শতকরা ৫০টী লোক যদি অচল টাকা হয়ে যায়, তাহলে ব্যবসাটা চলবে কি রকম করে শুনি?

জগৎটাকে আমরা এ রকমের একটা মহাজনের তহবিল বলে ভাবতে পারি না বলেই আমাদের জাতির ভেতর কোন একটা কর্ম্মের সাড়া নেই। কারণ, আমরা যে অদৃষ্টবাদী। ''কপালে যা আছে তাই হবে'', ভেবে যে আরাম কেদারায় শুয়ে থাকি। তাই হাজার হাজার লোক বেকার দেখেও আমাদের মনে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। মহাজনের ব্যবসাটা যে গোল্লায় যাবে, সে চিন্তা আমরা মোটেই করি না। আমরা ভাবি ভগবান যখন জন্ম দিয়েছেন। তখন কি আর মেরে ফেলবেন। আরে বাপু সবটাই যে নিজেকে করে নিতে হয়। ভগবান আর তোমার মুখে তুলে দিবেন না। তিনি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, তোমাকেই সব করে নিতে হবে।

দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে ব্যবসা-বানিজ্য। আমাদের দেশে আমদানি আছে, রপ্তানি আছে কি? আর যাও আছে, তা বিদেশীদের হাতে। আমাদের দেশ হতে চা, কাপি, তূলা, মসলা, পাট ও চামড়া—এই ত কয়টী জিনিষ রপ্তানি হয়ে থাকে। কিন্তু এর প্রত্যেকটীই সাহেবদের হাতে। তাই এসব নিয়ে তারা সুন্দর পুতুল খেলে থাকে। কাজেই সেটাও খরচের ঘরে। আমাদের দেশ হতে যে তূলা চার আনা সের দরে কিনে নিয়ে থাকে, আবার সেই তূলাই আমাদের কাছে সাড়ে ৬।। টাকা সের দরে বিক্রি করে থাকে। তারা যে শুধু ৬।. সোয়া ছয় টাকা লাভ নিয়েই ছেড়ে দেয় তা নয়। মালের সঙ্গে তার দেশের বহু সহস্র শ্রমজীবীর অন্ন জলের সংস্থানও করে। তোমার জিনিষ তোমাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছে। সুচতুর জাপান এক পয়সার জিনিষ এক টাকা দরে বিক্রী করে আজ জগতের সঙ্গে পাল্লা দিতে লেগে গিয়েছে। এই যে এক পয়সার জিনিষ এক টাকায় বিক্রী করবার ক্ষমতা, এটাই হচ্ছে শিল্প চাতুর্য্যের চরম উন্নতি। পাঁচ টাকার কাজ যদি পাঁচ পয়সা দিয়ে করা যায়, তাহলে আমি পাঁচ টাকা খরচ করতে যাব কেন? আমাদের দেশে কত শত রকমের হস্ত শিল্প, গৃহ-শিল্প ছিল, তা সবই আমাদের অবহেলার জন্য লোপ পেয়েছে। আজ আমরা জাপানী স্ক্রীন দরজায় টাঙ্গিয়ে জাপানী পাখায় হওয়া খেয়ে বিবিয়ানা জাহির করি। এতে আমাদের একটুও লজ্জা হয় না। আমাদের অধঃপতনের এই-ই প্রধান কারণ। আমরা আমাদের দেশীয় শিল্পের উন্নতি করা ত দূরের কথা, তাকে যে বাঁচিয়ে রাখব, বা যে চেষ্টা করছে তাকে উৎসাহ দেব, তাও করি না। কিন্তু দেখ গিয়ে স্বাধীন দেশে—সেখানকার লোকেরা নিজের দেশী জিনিষ থাকতে প্রাণান্তেও বিদেশী জিনিষ কিনবে না। আর এই কলকাতাই দেখুন না কেন—সাহেবরা কোন দিনই বিলাতী জিনিষ ছাড়া অন্য কোন জিনিষ

ক্রয় করে না। আমি অঙ্গোরায় দেখেছি, সেখানকার প্রবাসী ইংরেজরা, একটী তুর্কী দোকানে যে জিনিষটী আছে, সেই জিনিষই হয় ত দু'মাইল দূরের পথে হেঁটে, যেখানে লণ্ডনের তৈরী জিনিষ পাবে, সেখান হতে সেটা কিনে থাকে। তুর্কীরাও ঠিক তেমনি কাজ করে থাকে। বাজারে একটা নূতন জিনিষ বেরুলে, তা হাজার বেশী দর হলেও যদি জানে যে সেটা নিজ দেশের তৈরী—তাহলে বেশী মূল্য দিয়েও তা কিনে। আর ঠিক সেই জিনিষটীই যদি অতি অল্প মূল্যে বিদেশের তৈরী দেখতে পায় তা কিনে না। আর আমাদের দেশের অবস্থা কি? এই অসহযোগ আন্দোলনে খদ্দর কাপড় প্রচলনে কিছুদিন দেখা গেল, বিলাতী কাপড়ের দর একেবারে পড়ে গেছে। সাহেবরাও ছয় টাকা যোড়ার কাপড় তিন টাকা মূল্য করে দিল। আর

> আমাদের জাতির ভেতর কোন একটা কর্ম্মের সাড়া নেই। কারণ, আমরা যে অদৃষ্টবাদী। ''কপালে যা আছে তাই হবে'' ভেবে আরাম কেদারায় শুয়ে থাকি। হাজার হাজার লোক বেকার দেখেও মনে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। আমরা ভাবি ভগবান যখন জন্ম দিয়েছেন। তখন কি আর মেরে ফেলবেন।

যায় কোথা। বাঙ্গালী বাবুরা বিলাতী সস্তা দেখে আবার বিলাতী কাপড় কিনতে আরম্ভ করে দিলেন। একটু চিন্তাও করলেন না যে, যেদিন ইচ্ছা সে দিনই সাহেবরা আবার দর বাড়িয়ে দিতে পারে। লাভের মধ্যে এই হল যে দেশের একটা অতি প্রয়োজনীয় শিল্প চিরতরে লোপ পেতে লাগল। এরকম করে দেশের কত শিল্প যে আমরা নষ্ট করেছি, তা আর কত বলব। হয় ত অনেক শিল্পের নামও ভুলে গেছি। শিল্পগুলি বজায় রাখতে পারলে, শুধু যে কতকগুলি শ্রমজীবীর অন্নজলের ব্যবস্থা হয় তা নয়—দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারও বেড়ে থাকে। পূর্ব্বেই ত বলেছি যে আমাদের দেশে আমদানি হয়—রপ্তানি হয় না। ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের এক দিন ভেনিসের বণিকরা বড় সমাদর করত। এ সমস্ত শিল্প যদি আমরা বাঁচিয়ে রাখতাম, তাহলে আজ আমরা রপ্তানিও যথেষ্ট করতে পারতাম। আজ আমরাও ঠুনকো জিনিষ দিয়ে সাচ্চা মাল নিয়ে আনতে পারতাম।

অনেকে হয় ত এই পন্থাকে ভাল মনে করবেন না। কিন্তু জানেন কি, অর্থ-নৈতিকরা সব সময় ''সত্যের'' খুব কমই ধার ধারেন? অর্থ-নীতি সত্যকে যত না ভয় করে, সভ্যতাকে ভয় করে তার শতগুণে বেশী। কারণ সত্য জিনিষটা দৈব, আর সভ্যতা হচ্ছে মানবীয়। সত্যের সঙ্গে অর্থের কোন সম্বন্ধ নেই—পয়সার সম্বন্ধ এই সভ্যতার সঙ্গে। সত্যের কাছে মেকী মালের কোন মূল্য নেই। কিন্তু সভ্যতার কাছে তার যথেষ্ট সমাদর আছে।

ধরা যাক্, আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার অবস্থা কি? এখন আমরা সভ্যতার যে স্তরে এসে পা দিয়েছি—সেখানে চাই শুধু টাকা আর টাকা। যার ধন আছে, তার গৌরবও আছে। যে যত দামি পোষাক লাগাতে পারবে, সেই তত বড় ভদ্র। কাজেই, তুমি গরীব, তোমাকে যদি ভদ্র হতে হয়, তাহলে তোমার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে সেভাবে যদি সাজাতে পার, তবে ত ভদ্র হবে।

কিন্তু টাকা পাবে কোথায় শুনি। অথচ এদিকে বাহ্যিক জাঁক জমক না দেখালেও চলে না। এখন উপায়? দেশের সবাই ত আর রাজা নয় যে মণিমাণিক্য ব্যবহার করতে পারে। কাজেই, যারা ইকনমিষ্ট তারা এমনি চিন্তা করতে বসে যাবে—"আচ্ছা, কম পয়সায় মণি মুক্তার মত কি কোন জিনিষ তৈরী করা যায় না? নিশ্চয়ই যাবে। দেখি, রাসায়নিক ভায়ারা কি বলেন।"

সেদিন এক ইকনমিক জুয়েলারীর বিজ্ঞাপনে দেখতে পেলাম যে, তারা এক রকম সোণার চুড়ী তৈরী করেছেন, তাতে তামার উপর সোনার পাত বসান। সত্যিকার সোণার চুড়ী বলেই মনে হয়। পরীক্ষা করবার জন্য এক জোড়া কিনলাম। হাতে দিয়ে খুব হাসতে লাগলাম। হাসি পেল এই জন্য যে, জুয়েরার মশাই সভ্যতার গালে বেশ জুতা মারতে শিখেছেন। এই ত চাই। কম পয়সায় দুশ টাকায় বাবুগিরী করা যায়, এদিকে সভ্যতাও বুঝে নিলে যে, না বাঘের উপরও টাগ আছে।

বিলাতের সাহেবরা যখন ভারতীয় নীলের ব্যবসা একচেটে করে নিল, তখন জার্ম্মাণী ভাবলে "দাঁড়াও, তোমার চালাকী বের করছি। দেখি তোমার নীলের মত আমরা কিছু তৈরী করতে পারি কি না।"

কিছুদিন পরে দেখা গেল, জার্ম্মাণরা কি এক কৃত্রিম উপায়ে ভারতীয় নীলের চাইতেও ভাল নীল তৈরী করে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের মুখেও চূণকালি পড়ল। ভারতে নীলের চাষও বন্ধ হয়ে গেল! তাই বলছিলাম, সত্যের সঙ্গে অর্থ-নীতির কোন সম্বন্ধ নেই। ইকনমিষ্টদের সর্ব্বদাই লক্ষ্য থাকে, এক টাকা দিয়ে দশ টাকার কাজ কি করে করা যায়; এবং সেটা এমন বাহাদুরী নিয়ে করা চাই, যাতে কেহ কোন খুঁৎ ধরতে না পারে। এই চালাকী যে জাতির ভেতর বেশী, সে জাতি আজ অর্থে ধনকুবের। এবং এই পন্থাকেই বলে শিল্প-চাতুর্য্য। এই শিল্প-চাতুর্য্য দিয়ে সভ্যতাকে কেনা গোলাম করা যায়।

সভ্যতা জিনিষটা এমন কিছু নয়। ওটাকে আমরা ইচ্ছা করলেই হাতের মুটয় আনতে পারি এবং একেবারে ন্যাংটী-ছাড়া করে ছেড়েও দিতে পারি। যতদিন সভ্যতা আমাদের হাতের মুটোয় ছিল—তত দিন দেশের লোক টাকা পয়সার জন্য বড় চিন্তা করে নাই। যেদিন হতে হাত-ছাড়া হয়েছে সেই দিন হতেই দেশবাসী হা অন্ন! হা টাকা! করছে। আমি আর এক জায়গায় বলেছিলাম যে, আমরা সাহেব সাজতে চাই—কিন্তু সাহেব সাজবার মত মাল মসলা আমাদের নেই।

তার মানে আমাদের সভ্যতা আমাদের হাত ছাড়া। তার একটা মাপ কাঠি নেই। সে দিন দিনই মাপকাঠি ডিঙ্গিয়ে চলছে। এদিকে আর্থিক অবস্থা কিন্তু মাপকাঠি পর্য্যন্তও পৌঁছাতে পারে নাই। এর পরিণাম ভাল নয়—এবং কোন দিনই ভাল হতে পারে না। গত মহাযুদ্ধের সময় বিলাতে আইন করে দেশের লোকের বাবুগিরী কমিয়েছিল। তার অর্থ এই যে, তখন বিলাতের সভ্যতা তার আর্থিক অবস্থার মাপকাঠি ডিঙ্গিয়ে চলছিল।

আমরা চাই ভারত আমেরিকা হউক, জাপান হউক, ইংলণ্ড হউক—কিন্তু সেটা যেন শুধু থিয়েটার বায়স্কোপ ও মটর হাঁকানির দিকে না হয়। সে যেন তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্যে মূর্ত্তিময়ী হয়ে ফুটে উঠে। তবে দেশের কল্যাণ ও দশের কল্যাণ।

ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩১